কান্না হাসির সমুদ্র

শুজা রশীদ

এক

সজলের মন ভালো নেই । বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে, মায়ের শরীর খারাপ, এখন তখন অবস্থা । এই ধরনের চিঠি পাবার সাথে সাথেই বাক্স-পেটরা গুছিয়ে রওনা দেবার কথা, কিন্তু সজলের পক্ষে সেটা সম্ভব হচ্ছে না । পকেটে মহাশূন্যতা । এই বাড়ির কারো কাছে চাইতেও লজ্জা হচ্ছে । এরা দয়া করে তাকে আশ্রয় দিয়েছেন, সেটাই অনেক । এদের কাছে হাত পাতার প্রশ্নই ওঠে না । সজল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে । একটা চাকরির আশায় এখানে পড়ে আছে সে । সোলায়মান চাচা চেষ্টা করবেন বলে কথা দিয়েছেন, তার মতো মানুষের কথায় আস্থা রাখা যায় ।
ঘন করে রাত নামছে চারদিকে, ঝিরঝিরিয়ে বাতাস বইছে । প্রায় লুকিয়ে ছাদে উঠে এলো সজল । সে বাসার মধ্যে বেশি ঘোরাঘুরি করে, এটা পছন্দ করে না শিরিন চাচি । সেই জন্যেই এই সতর্কতাটুকু অবলম্বন করতে হয় । পশ্চিম আকাশে এখনো ঈষৎ বেগুনি ছোপ লেগে রয়েছে, পালতোলা নৌকার মতো কালো মেঘ হেসে বেড়াচ্ছে । অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে সজল, মায়ের মিষ্টি মুখখানি মনে পড়ে । আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরই চাকরি হবে তার, বাড়ী যাবে সে, খুব গম্ভীর মুখে মাকে কদমবুছি করবে । মা উদ্বিগ্নস্বরে জানতে চাইবে জ্জ কি হলো রে খোকা, চাকরি- টাকরি?
সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলবে – হ্যাঁ, মা । আমার চাকরি হয়ে গেছে ।
আনন্দে উত্তেজনায় চক্‌চক্ করে উঠবে মায়ের চোখ ।
– দুষ্টু ছেলে, কেমন ঢং করছে । আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম– ।
সজলের চোখে পানি এসে যায় । মায়ের সাথে আবার দেখা হবে কিনা কে জানে?
নিঃশব্দে উপরে উঠে এলো নেলী । বিকেল থেকেই মাথাটা ঝিম্ ধরে আছে, খোলা বাতাসে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলে ভালো লাগা উচিৎ । সজলকে দেখে বিরক্ত হলো সে ।
– কে ওখানে?
– জ্বি, আমি সজল ।
– এখানে কি করছেন?
– এমনিই দাঁড়িয়ে আছি । মনটা খারাপ ।
– কিছু হয়েছে?
– জ্বি, বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে । মায়ের শরীর খুব খারাপ । বাঁচা মরার প্রশ্ন ।
– তাহলে তো আপনার বাড়ি চলে যাওয়া উচিৎ ।

– জ্বি, যাওয়া তো উচিৎ। কিন্তু চাচা একটা চাকরি দেবেন বলেছেন। এখন চলে যাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না। তাই না?
– কি আশ্চর্য! সেটা আমি কি করে বলবো? আপনার মায়ের শরীর খারাপ, বাড়ী যাওয়া না যাওয়াটা আপনার ব্যাপার। যাই হোক, আপনি এখন নিচে যান। আমি হাঁটবো।
– জ্বি, যাচ্ছি।
সজল ফিরতি পথ ধরলে নেলী পিছু ডাকলো।
– শুনুন।
– জ্বি?
– বাসার মধ্যে এমন চোরের মতো ঘোরাফেরা করবেন না। মাসখানেক হলো এসেছেন, এতোদিনে আরো সহজ হয়ে যাওয়া উচিৎ ছিলো।
সজল কিছু বলে না। নেলী বিরক্ত হলো।
– ঠিক আছে, আপনি নিচে যান। আমার ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না। আজ আমার মন ভালো নেই।
দ্রুত নিচে নেমে আসে সজল। নেলী মেয়েটি সুন্দরী এবং অহংকারী। তার সামনে দাঁড়ালেই সজলের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। গলা শুকিয়ে আসে।
নিচতলায় একখানা ছোটখাটো ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছে সজলকে। দরজার মুখোমুখি একখানা জানালা, ভোরবেলা হু-হু করে বাতাস বয়। ভোরের এই হিমেল বাতাসটুকু ভীষণ পছন্দ সজলের, কেমন যেন একধরনের আন্তরিকতার ছোঁয়া আছে, প্রতিদিনকার হাজারো অবহেলার কথা অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভুলে থাকা যায়।
ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো সজল। রাঁধুনি আলবার্ট বিছানায় গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। মাঝবয়সী লোক, এক মাথা টাক এবং একগাল দাড়িতে তার ভুড়ি সর্বস্ব শরীরটাকে অপার্থিব কিছু মনে হয়। রাতদিন ক্যাঁচকুঁচ করে পান চিবায় এবং দেয়াল, মেঝে যেখানে সুবিধা হয় পিক্ ফেলে। এই কারণে প্রচুর গঞ্জনা সহ্য করতে হয় তাকে, কিন্তু সে কান দেয় না।
– কি ব্যাপার আলবার্ট, কিছু বলবে?
চোয়াল নাড়ানো বন্ধ করে আলবার্ট, তীক্ষ্ণ চোখে সজলকে পরখ করে।
– আপনি কিছু জানেন না?
– কোন বিষয়ে?
– গোলমালের কথা।
– কিসের গোলমাল?
আবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকে লক্ষ্য করে আলবার্ট। – আপনি মনে হচ্ছে সত্যিই কিছু জানেন না। বসেন, ঘটনাটা আপনাকে শোনাই।
– যা বলার খুব ছোট্ট করে বলবে। তোমার ফালতু প্যাচাল শুনতে ভালো লাগে না।
হ্যাহ্ হ্যাহ্ শব্দে হাসে আলবার্ট। – ওটা হচ্ছে জন্মগত দোষ। কথা একটু বেশি বলি। কিন্তু তাতে তো কারো কোনো ক্ষতি হয় না। যাই হোক, আসল ঘটনাটা ...। হঠাৎ স্বর খাদে নামিয়ে ফেলে সে। – বুঝলেন দাদাভাই, সাহেবের কারখানায় গোলমাল হয়েছে। কাজ বন্ধ। বন্ধ মানে একদম বন্ধ। কোনো শালা আর কাজ করবে না। আগে মাইনে বাড়াও, সুযোগ সুবিধা বাড়াও, তারপর কল চলবে। কি বুঝলেন ভদ্দর লোক, চাঁপা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আলবার্টের নাদুস নুদুস মুখখানা– সাহেবের অবস্থা কাঁচকলা। হাঃ হাঃ হাঃ–
সজল বিপাকে পড়লো। খবর শুনে যতোদূর বোঝা যাচ্ছে এটা একটা দুঃসংবাদ। কিন্তু ব্যাটা এতো হাসছে কেন? এটা কোনো আনন্দের বিষয় হলো। সে বিরক্ত কণ্ঠে বললো– আলবার্ট।

– কিছু বলবেন দাদাভাই?
– তুমি এখন দয়া করে বাইরে যাও। আমি একটু পড়াশুনা করবো।
– তা কি করবেন, করেন না। আমি এই কোণায় একটুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি, কি বলেন?
– না না, তুমি এখন যাও। আমার মনটা আজ ভালো নেই।
যাবার আগে বিড়বিড় করে কয়েকটা গাল কষলো আলবার্ট। কিছু বললো না সজল। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়, অনেক কিছু।

দুই

বছরখানেক হলো বিয়ে হয়েছে লিমার। কিন্তু স্বপ্নিলকে আজও ঠিকমতো চিনে উঠতে পারেনি সে। এতো খামখেয়ালী এবং রগচটা মানুষ বোধ হয় খুব কমই আছে। স্রেফ তাৎক্ষণিক আবেগের বশে চলে মানুষটা, চিন্তাভাবনার খুব একটা ধার ধারে না। তবে মনটা ভালো, খুবই ভালো, সবার জন্যেই কম বেশি অনুভূতি আছে।
বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় একটা তারকালোক পড়ছিলো, হঠাৎ মহা বিরক্ত হয়ে পত্রিকাটা ছুড়ে ফেললো, বাতাসে সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে মেঝেতে আছড়ে পড়লো সেটা।
লিমা অবাক হয়ে বললো – কি হলো!
– আর বলো না, এক পাতা জুড়ে জুহির ছবি। শালীর যদি একটু কা-জ্ঞান থাকতো। খেয়ে খেয়ে বাতাবী লেবু বানিয়েছে শরীরটাকে, দেখলেও পিত্তি জ্বলে।
হাতের সেলাইটাকে একপাশে সরিয়ে রাখলো লিমা।
– পিত্তি জ্বললেই সব কিছু ছুড়ে ফেলতে হবে এমন কোনো কথা নেই। চা খাবে?
– হুঁ। ঠা-া কিছু থাকলেও নিয়ে এসো।
– গরম-ঠা-া এক সাথেই খাবে?
– বেশি কথা বলো না। যা বলছি করো।
– আমার সাথে এভাবে কথা বলবে না। আমি কারো চাকর নই।
স্বপ্নিল হেসে উঠলো। – তোমাকে রাগানো খুব সহজ।
লিমা মুখ ঝামটা দিলো– থাক, আর হাসতে হবে না।
দু'কাপ চা নিয়ে ফিরে এলো সে। চোখ কুঁচকালো স্বপ্নিল। –ঠা-াটা কোথায়?
– আসছে। নসুকে দোকানে পাঠিয়েছি।
– কেন, বাসায় খান কতক এনে রাখতে পারো না? বাসায় তো গ-া গ-া ফ্রিজ।
– পারতাম যদি আমার স্বামীর কিছু রোজগার থাকতো। পরের টাকায় চলতে গেলে একটু বুঝে সুঝে চলতে হয়।

একটুও বিব্রত বোধ করলো না স্বপ্নিল। ঠা-ঠা করে হাসলো। – তুমি একটা পাজি মেয়ে। আমাকে জব্দ করার জন্য রাতদিন এক জাতীয় কথা বলো। কিন্তু লাভ নেই, কারণ লজ্জা শরম বলে আমার কিছু নেই।
– বাজে কথা বলো না। বিয়ের পর থেকেই দেখছি শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছো। কখনো কিছু করতে ইচ্ছে হয় না তোমার? বাবার উপর আর কতদিন? তাছাড়া তোমার না হয় লাজ-লজ্জা নেই, কিন্তু আমার তো আছে। ইতিমধ্যেই আমাদের বাসায় নানান কথা উঠতে শুরু করেছে। সেদিন তো সিদ্দিক মামা মুখের উপরেই বলে দিলো– বিয়েটা তুই কাকে করেছিস, ছেলেকে, না ছেলের বাপকে? লজ্জায় অপমানে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো, এখনও সময় আছে, কিছু একটা করো।
অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকলো স্বপ্নিল। চায়ের কাপে আনমনে দু'তিনটি চুমুক দিলো।
– কি ভাবছো?
– তোমার এই মামাটা, সিদ্দিক না ফিদ্দিক, থাকে কোথায়?
– কেন?
– কোথায় থাকে তাই বলো।
– চিটাগাং।
অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চুলে হাত দিলো স্বপ্নিল। –কালই তাহলে চিটাগাং যেতে হচ্ছে। ব্যাটাকে একটা রাম ধোলাই দিতে হবে। বাসার ঠিকানা জানো তো নাকি?
থ'মেরে গেলো লিমা– কি যা তা বলছো?
– যা তা মানে? এমন একটা ফাউল কথা বলে ব্যাটা পার পেয়ে যাবে, তাই হয় নাকি? শালারে এমন প্যাদানী দেবো না, বাপের নাম ভুলে যাবে।
এই লোককে বিশ্বাস নেই। হয়তো সত্যি সত্যিই চিটাগাং গিয়ে হাজির হবে। লিমা চোখ পাকালো।
– খবর্দার, মামাকে যদি এই নিয়ে কিছু বলতে যাও তাহলে সারা জীবনে আর আমার মুখ দেখবে না তুমি।
– এটা কোনো কথা হলো? এমন একটা বাজে কথা ব্যাটা বলে দিব্যি নেচে গেয়ে বেড়াবে।
– তার যা খুশি সে করে বেড়াক। আমি চাই তুমি একটা কিছু করো। তাহলে কেউই আর কিছু বলতে পারবে না।
ব্যস্ত পায়ে ভেতরে ঢুকলো নসু। বয়স বড় জোর তের চৌদ্দ, শরীরখানা বাড়ন্ত, ফলে বেশ বড়সড় দেখায়। ছেলেটি অতিরিক্ত হাসে, বকুনীও খেতে হয় অফুরন্ত।
– এনেছি ভাবী।
– কি এনেছিসরে পাগলা। কড়া গলায় জানতে চাইলো স্বপ্নিল।
– কুকা কুলা । নসু দাঁত বের করে হাসতে থাকে।
– চোপ বেয়াদপ। সারাদিন এতো ফ্যাক ফ্যাক করে হাসিস কেন? যা ওটা বদলে ফানটা নিয়ে আয়।
– জি, ফান্টা ঠা-া হবে না।
– তাহলে মিরিন্ডা নিয়ে আয়।
– মিরিন্ডাও ঠান্ডা নাই।
– নাই মানে? যেখান থেকে পারিস নিয়ে আয়।
নসুর হাত থেকে কোকের বোতলটা নিলো লিমা। – আপাতত এটাই খাও। অযথা ঝামেলা করো না। নসু, তুই যা।
স্বপ্নিলের ইচ্ছে হলো কোকের বোতলটাকে দেয়ালে আছাড় মারে, কিন্তু সাহস পেলো না। লিমা প্রচ-ক্ষেপে যাবে।
– একটা কথা শুনলাম, হাতের সেলাইটাকে আবার টেনে নিলো লিমা।

– কি কথা?
–বাবার কারখানায় নাকি কি সব গোলমাল হচ্ছে?
– হলে হচ্ছে। আমার ওসব খবরের দরকারটা কি?
– দরকার কি মানে? ব্যবসার দায়-দায়িত্ব সব বাবার নাকি? তোমার কি একটু সাহায্য করা উচিৎ না?
– উচিৎ আলবৎ উচিৎ। কিন্তু বাবা তা চান না। এই বিশাল হাওলাদার সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে থাকতে চান তিনি। মহা পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ মহামান্য নওয়াব সোলায়মান হাওলাদার।
– এভাবে কথা বলো না। তোমরা সবাই এমন নির্বিকার থাকো বলেই বাবা তোমাদের ডাকেন না। তার বয়স হয়েছে, এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।
– ছ্যা ছ্যা, কি যা তা বলছো! সম্রাটদের কি কখনো বিশ্রাম নিলে চলে?
– আবার!
– ঠিক আছে আর বলবো না। কিন্তু তুমিও আমাকে ঐ ভদ্রলোকের ব্যবসায় নাক গলাতে বলো না। অকারণে নাকটা হারাতে হবে।
নসু ভেতরে ঢুকলো। – ভাবী, আম্মা ডাকে।
– এই শালা ভাগ। প্রচ- ধমক কষলো স্বপ্নিল। নসু একগাল হাসি নিয়ে পালালো। লিমা বিরক্ত হলো।
– ওকে এতো ধমকাও কেন বল তো?
–ব্যাটার সাথে একটু মশকরা করি। দেখনি, ধমক খেলে কেমন মাড়ি বের করে হাসে। খুব চালাক ছোঁকরা, মহা চালাক।
লিমা চলে যাচ্ছিলো, স্বপ্নিল পিছু ডাকলো।
– ডাকছো কেন আবার?
– গোলমালের কথা কি যেন বলছিলে?
– আমি তেমন কিছু জানি না। তবে শুনলাম কারখানায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছে। তাদেরকে কিছুতেই ঠা-া করা যাচ্ছে না। দু'দিন ধরে কাজ বন্ধ।
– তাই নাকি। এতো দেখি সাংঘাতিক ঘটনা। অথচ আমি একটা খবর পর্যন্ত পেলাম না। তাজ্জব ব্যাপার।
লিমা চলে যেতেই বিছানা ছাড়লো স্বপ্নিল। দ্রুতহাতে ট্রাউজার, শার্ট পরলো। এক্ষুনিই একবার শ্রমিক পাড়ায় যাওয়া দরকার। বেশ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি।

তিন

মগবাজারে ছোট একটা বাসার সামনে রিক্সা দাঁড় করালো শিলা। ভাড়া মিটিয়ে দিলো। দরজায় টোকা দিতেই কম বয়সী ভদ্র ঘরের একটা ছেলে দরজা খুলে দিলো।
– কাকে চান?
– চঞ্চল আছে এখানে?
নির্বিকার দৃষ্টিতে ওকে কিছুক্ষণ নিরীখ করলো ছেলেটা।
– আছেন। কিন্তু তার সাথে এখন কথা বলা যাবে না।

– কিন্তু ওর সাথে দেখা করাটা আমার কাছে খুবই দরকারি ওকে একটু ডেকে দাও ।
– বললাম তো তার সাথে এখন কথা বলা যাবে না ।
– ও কি নেশা-টেশা করেছে?
অধৈর্য ভঙ্গিতে কপাল চুলকালো ছেলেটা– হ্যাঁ ।
– ভেতরে আর কেউ আছে?
– না ।
– তাহলে আমি একটু ভেতরে ঢুকে বসি?
ঘোড়ার মতো মেঝেতে পা ঠোকে ছেলেটা । – খামাখা ঝামেলা করছেন কেন?
– প্লিজ ভাই । একটু বসি । ওকে আমার খুব দরকার ।
কি করবে বুঝতে পারে না ছেলেটা । তাকে প্রায় ঠেলে ভেতরে ঢুকলো শিলা । পাশাপাশি দুটো কামরা । এই ঘরটাতে আসবাবপত্র বলতে একটা খাট আর দুটো চেয়ার । পাশের কামরায় একটা ডিম লাইট জ্বলছে, ভেতরের সবকিছুই অস্পষ্ট ।
দরজা বন্ধ করলো ছেলেটা । – চঞ্চল ভাই ও ঘরে আছেন ।
– হেরোইন? সহজ কণ্ঠে জানতে চাইলো শিলা ।
– হ্যাঁ ।
চেয়ারে বসলো শিলা । – তোমার নাম কি?
– লাভলু ।
– পড়াশোনা করো?
– হ্যাঁ । ইন্টারমিডিয়েট ।
– আমি থাকলে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না তো?
– না ।
লাভলু পাশের ঘরে চলে গেলে শিলার ইচ্ছে হলো উঠে গিয়ে চঞ্চলকে দেখে আসে । কিন্তু উঠলো না । চঞ্চলের নেশাগ্রস্ত রূপ তার ভালো লাগে না ।
আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো । সহজভাবে হেঁটে শিলার সামনে এসে দাঁড়ালো চঞ্চল । মাঝারি উচ্চতার স্বাস্থ্যবান যুবক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এলোমেলো ঝাঁকড়া চুল, চোখজোড়া শান্ত, গম্ভীর ।
– কি ব্যাপার, শিলা?
– তোমার সাথে কিছু কথা ছিলো ।
চঞ্চল অন্য চেয়ারটা টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসলো ।
– তোমার বিয়ে ঠিক হচ্ছে, তাই তো?
– তুমি জানো?
– জানি ।
– সব জেনেও তুমি নেশা করে পড়ে আছো?
চঞ্চল দীর্ঘক্ষণ কোনো উত্তর দিলো না ।
– কথা বলছো না কেন?
– শিলা, তুমি তো আমাকে বেশ ভালো করেই চেনো, তাই না?
– মনে তো হয় ।
– তুমি তো জানোই, এই পৃথিবীতে কোনো কিছুর প্রতিই আমি তেমন আকর্ষণ অনুভব করি না । তোমাকে আমি পছন্দ করি, কিন্তু তোমাকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে এমনটি কখনো মনে হয় না । বরং বিয়ে করে তুমি সুখী হলেই আমার বেশ ভালো লাগবে ।

– অর্থাৎ, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছো?
–হুঁ, তাই ।
হতাশ হলো না শিলা । এমন যে হবে, সেটা ও আগেই আন্দাজ করেছিলো । নিষ্পলক চোখে চঞ্চলকে দেখলো ।
– আমরা দু'জন মিলেও তো একটা সুখের সংসার গড়তে পারি । পারি না?
– মনে হয় না । সংসার জীবনটা আমার পছন্দ না ।
শিলা বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল– নিজের জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করলে কার কি করার আছে? । অনেক চেষ্টা করেছি আমি । কিছুতেই কিছু হলো না । যাক, অনেক রাত হয়েছে । আমি যাই ।
– দাঁড়াও, লাভলু তোমাকে পৌঁছে দেবে ।
– দরকার নেই ।
– দরকার আছে । রাতের বেলা অনেক বিপদ-আপদ হতে পারে । বাসায় গিয়ে লিমাকে ফোন করে বলো আমি রাতে ফিরবো না । নইলে ও দুশ্চিন্তায় থাকবে ।
– তোমার সিদ্ধান্ত যদি পালটায় তাহলে আমাকে জানাতে দ্বিধা করো না ।
– মনে থাকবে ।
পথে একটাও কথা বললো না লাভলু । শিলার প্রশ্নগুলো মাঠে মারা গেলো । বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকলো সে । তার মন খারাপ হয়ে গেছে । চঞ্চলকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন ছিলো, সব ভেঙ্গে গেলো । স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা অত্যন্ত অসহনীয়, মুহূর্তের মধ্যে জীবনটাকে অর্থহীন মনে হয় ।
বাসার গেটে রিক্সা থামতেই দারোয়ান বেরিয়ে এলো ।
– এতক্ষণে এলেন আপা? আমরা তো আপনাকে খুঁজতে বেরুচ্ছিলাম । গাড়িও নিয়ে যাননি, কাউকে কিছু বলেও যাননি ।
– বাবা মা খুব দুশ্চিন্তা করছে বুঝি?
– হ্যাঁ, আপা ।
লাভলু আড়ষ্ঠ ভঙ্গিতে বসেছিলো । শিলা ডাকলো– লাভলু নামো । এক কাপ চা খেয়ে যাও, আমি নিজের হাতে বানিয়ে দেবো ।
লাভলু নামলো না । – আমি যাবো ।
– এখুনিই যাবে কেন? একটু বসো না ।
– না, আমি যাবো ।
শ্রাগ করলো শিলা । এই ছেলেটাও চঞ্চলের মতো দুর্বোধ্য । রিক্সাওয়ালাকে বিশ টাকার একটা নোট দিলো সে ।
– একে মগবাজার পৌঁছে দিও । লাভলু কখনো যদি ইচ্ছে হয় চলে এসো । তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে । যদি সম্ভব হয় চঞ্চলের কাছ থেকে দূরে সরে যেও । ও নিজেও ধ্বংস হচ্ছে, তোমাকেও ধ্বংস করবে ।
– শিলা আপা, একটা কথা বলবো?
– কি কথা, বলো ।
– চঞ্চল ভাই আপনাকে খুব ভালোবাসেন । উনি সব সময় আপনার কথা বলেন । নেশার ঘোরেও ।
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো শিলা । – আমি ওকে বুঝতে পারি না লাভলু । একটুও না । ও যেন অন্য কোনো জগতের মানুষ ।
– যাই, শিলা আপা ।
– এসো, লাভলু ।

রিক্সাটা যতক্ষণ দেখা গেলো, তাকিয়েই থাকলো শিলা। এই ছেলেটার অনেক পরিবর্তন হবে, এও একদিন অন্য জগতের মানুষ হয়ে যাবে।

চার

রাত ন'টা। এতক্ষণে বাসায় ফিরে যাওয়ার কথা সোলায়মান হাওলাদারের। কিন্তু অফিস ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করছে না তার। মনটা অশান্ত হয়ে আছে। চারদিকে গোলমাল পাকিয়ে উঠছে। শান্তিতে কাজ করার জো নেই আর। সবচেয়ে বেশি ঝামেলা বাধাচ্ছে কারখানাটা। কথা নেই বার্তা নেই ধর্মঘট করে বসে আছে শ্রমিকেরা। নানান বাহানা তাদের। বেতন বাড়াও, দালান কোঠা দাও, ছেলেমেয়েগুলোকে জজ ব্যারিস্টার বানিয়ে দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাবখানা এমন যেন কারখানায় ওদের কাজ দিয়েই মহাপাতকের কাজ করেছেন তিনি।
দিলবক্স ভেতরে ঢুকলো। সোলায়মান এন্টারপ্রাইজের ম্যানেজার সে। খুবই চালাক চতুর লোক। অতিরিক্ত মাথা খাটিয়ে অল্প বয়সেই চুল পাকিয়ে ফেলেছে।
– স্যার, জলিলরা এসেছে।
– ভেতরে পাঠাও।
একটু ইতস্তত করলো দিলবক্স। – আলাপটা কি আপনিই করবেন স্যার? নাকি আপনার হয়ে আমিই যা বলার বলবো?
অর্থাৎ ব্যাপারটা তার পছন্দ হচ্ছে না। গম্ভীর চোখে তাকে দেখলেন সোলায়মান।
– এতোদিন তো তুমিই যা বলার বলেছো। কাজ কিছু হয়নি। এবার দেখা যাক, আমি কিছু করতে পারি কিনা। ভেতরে পাঠাও ওদেরকে।
তবুও দ্বিধা করছে দিলবক্স। – ওরা কারখানার সাধারণ শ্রমিক, স্যার। ওদেরকে এতোটা আস্কারা দেওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না।
গত বিশ বছর ধরে তার সাথে সাথে আছে লোকটা। এর বুদ্ধি বিবেচনার উপর মোটামুটি শ্রদ্ধা আছে সোলায়মানের। কিন্তু কারখানার ব্যাপারে এই লোকের অতিরিক্ত নমনীয় মানসিকতা বারবার আর্থিক ভারসাম্যহীনতার সূচনা করেছে। শান্তভাবে একটা চুরুট ধরালেন তিনি। 'দিলবক্স চৌধুরী।'
– জি স্যার?
– ওদের ভেতরে পাঠিয়ে দাও।
বেরিয়ে এলো দিলবক্স। অশনি সংকেত পাচ্ছে সে। বিপদ আসছে। ঘোরতর বিপদ। চেয়ারে পায়ের উপর পা তুলে বসেছিল ত্রিশোর্ধ শক্তিশালী দর্শন দু'জন লোক। ডোরাকাটা লুঙ্গির সাথে চকরাবকরা শার্ট পরেছে। রোমশ বুকের অধিকাংশই অনাবৃত।
– কি বললেন স্যার? সমস্বরে জানতে চাইলো তারা।
– ভেতরে যাও। স্যার তোমাদের সাথে কথা বলবেন।

জলিল এবং আজাদ উঠে দাঁড়ায়। দৃঢ় পদক্ষেপে সোলায়মানের কামরার দিকে হাঁটতে থাকে। দিলবক্স নিজের কামরায় ঢুকলো। ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে দিয়ে নরম গদিমোড়া চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসলো। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। এতোকাল যে চরম সিদ্ধান্ত সে ছলে বলে এড়িয়ে গেছে আজ বোধ হয় তাই নিতে চলেছেন স্যার।

সামনে দাঁড়ানো শ্রমিক দু'জনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছেন সোলায়মান। বহুদিন ধরে এরা তার হয়ে গুপ্তচরের কাজ করেছে। কারখানা চালাতে গেলে এই ধরনের দু'চারজন বিশ্বাসঘাতকের সক্রিয় সাহায্যের প্রয়োজন আছে।

একমনে মিনিটখানেক ফুঁকলেন সোলায়মান। ধোঁয়ার অস্বচ্ছ পর্দা তৈরি করলেন মুখের সামনে। রিভলভিং চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে সামান্য কাত হয়ে বসলেন। গুরুগম্ভীর একটি পরিবেশ তৈরি হলো।

– জলিল।

– জি স্যার?

– গোলমালটা পাকাচ্ছে কারা?

– লতিফ আর অনিরুদ্ধই পালের গোদা স্যার। ওদের সাথে জোট বেঁধেছে আলেক, আরশানরা। বাকীরা স্রেফ ওদের কথায় উঠছে বসছে।

দীর্ঘ দু'মিনিট কোনো কথা বললেন না সোলায়মান।

– জলিল!

– জি স্যার?

– লতিফ খুব ঝামেলা করছে।

– জি স্যার।

– লোকটা চরিত্রহীন, লম্পট, মদ্যপ।

– জি স্যার।

– ওকে সামলাও।

– ঠিক আছে স্যার।

লম্বা সালাম ঠুকলো দু'জন। বেরিয়ে গেলো। হাত দিয়ে ধোঁয়ার পর্দাটা সরালেন সোলায়মান। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চুরুটটা ময়লার বাকসে ফেললেন। উঠে দু'চক্কর পায়চারি করলেন। মনটা বেশ শান্ত হয়েছে। এবার বাড়ি ফেরা যায়।

পাঁচ

দরজায় মৃদু টোকার শব্দে ঘুম ভাঙলো সজলের। নির্ঘাত হারামীটা। সারাদিন জ্বালিয়েও খায়েস মেটে না, ভোর সকালে এসে খটাখট শুরু করে। অসহ্য।

দরজা খুলেই ভড়কে গেলো সে। অভাবিত দৃশ্য। নেলী দাঁড়িয়ে আছে। চোখ জোড়া ঈষৎ লাল, বোধ হয় রাতে ভালো ঘুম হয়নি।
– আপনি!
– বিরক্ত হলেন নাকি?
– না না।
– রাতে ভালো ঘুম হয়নি। মাথাটা দপ্ দপ্ করছে। একটু হাঁটতে বেরুবো। আসবেন আমার সাথে?
– নিশ্চয়। একটু দাঁড়ান, আমি তৈরি হয়ে নেই।
– আমি গেটে দাঁড়াচ্ছি, আপনি আসুন।
দ্রুত শার্ট-প্যান্ট পরে বেরিয়ে এলো সজল। অত্যাশ্চার্য ব্যাপার। তার ধারণা ছিলো নেলী তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না।
অনেকখানি পথ নিঃশব্দে হাঁটলো নেলী। সজলের অপ্রস্তুত ভাব দেখে বেশ মজা পাচ্ছে সে। লোকটাকে যতটা গেঁয়ো মনে হয়, আসলে তা নয়। বেশ বুদ্ধি সুদ্ধি আছে, ব্যবহারেও এক ধরনের নম্রতা আছে। এই ধরনের মানুষকে অপছন্দ করা যায় না।
– কি ঠিক করলেন? বাড়ি যাবেন?
– জ্বি?
– বলছি, মাকে দেখতে বাড়ি যাবেন?
– যেতে তো চাই, কিন্তু – মানে বুঝতেই তো পারছেন, চাচা একটা চাকরি দেবেন বলেছেন– এখন যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। তাছাড়া বাবাও চিঠিতে বাড়ি যেতে মানা করেছেন। কি করবো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।
– আমি বেশ বুঝতে পারছি। আপনার যেতে ইচ্ছে করছে কিন্তু হাতে পয়সা-কড়ি নেই বলে যেতে পারছেন না। ঠিক তো?
সজল খুবই লজ্জিত হয়ে পড়লো। কিছু বললো না।
– এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। আপনি যদি সত্যিই বাড়ি যেতে চান তাহলে আমি আপনাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারি।
– জ্বি না, তার দরকার নেই। আমি বাড়ি যাবো না।
মুখ ঘুরিয়ে তাকালো নেলী। –আপনার আত্মসম্মান জ্ঞান খুব প্রখর দেখছি।
– জ্বি না, আমার কোনো আত্মসম্মান নেই। থাকলে গত একমাস ধরে আপনাদেরকে বিরক্ত করতাম না।
– বিরক্ত করছেন কোথায়? আপনি যে বাসায় আছেন তাই তো টের পাওয়া যায় না।
কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটলো নেলী। ইচ্ছে করেই একটু পিছিয়ে পড়লো সজল, মেয়েটার হাঁটার ভঙ্গি খুবই সুন্দর, তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ধানমন্ডি লেকের পাশে খানিকটা পরিষ্কার জায়গা দেখে বসে পড়লো নেলী।
– বসুন।
বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে বসলো সজল। ভোরের স্বচ্ছতায় ভীষণ নীল দেখাচ্ছে লেকের পানি, মৃদু বাতাসে সৃষ্টি হচ্ছে হিল্লোলিত তরঙ্গের। এই রকম পানিতে পা ডুবিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে ইচ্ছে করে।
– আপনার চাকরিটা বোধ হয় হবে না।
– কেন?
– শোনেন নি, বাবার কারখানায় গোলমাল হচ্ছে।
– জ্বি শুনেছি।

– কিছুতেই শ্রমিকদের শান্ত করা যাচ্ছে না। বাবার মেজাজ খুব খারাপ। আপাতত আপনার চাকরির তেমন কোনো আশা আছে বলে মনে হয় না।
সজল চুপিচুপি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।
– মন খারাপ হয়ে গেলো নাকি?
– জ্বি, তা একটু হয়েছে।
– মন খারাপ করার কি আছে? থাকুন আরো কিছুদিন। ঝামেলা মিটে গেলে বাবার কানে কথাটা আবার তুলবেন। তার হয়তো কিছু মনেই নেই।
কথাটা ঠিক নয়। গতকাল সকালেও সোলায়মান সজলের পিঠ চাপড়ে বলেছেন– ভেবো না, চাকরি তোমার একটা হবেই। ব্যাপারটা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করলো না সজল। এই মেয়েটা যাই বলুক, সেটাকে সত্য বলে মেনে নিতে তার কোনো আপত্তি নেই।
নেলী অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললো – আচ্ছা সজল, আপনার কি কখনো নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়?
– জ্বি না। আমি ছোটবেলা থেকেই একাকী থাকতে অভ্যস্ত।
– কেন, আপনার বন্ধু-বান্ধব ছিলো না?
– ছিলো। কিন্তু আমার একা থাকতেই ভালো লাগতো।
– আপনি দেখি অদ্ভুত মানুষ। আমার কিন্তু খুব হৈ-চৈ করতে ইচ্ছে করে। পাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করে। সমুদ্রে যেতে ইচ্ছে করে–
– আপনাকে তো আমি বাসা থেকে বের হতেই দেখি না।
নেলী একটু গম্ভীর হয়ে পড়লো। –আমি কি করি না করি আপনি কি তার সবই লক্ষ্য করেন?
– জ্বি না। এই ব্যাপারটা এমনিতেই লক্ষ্য করলাম।
– নিশ্চয় খুব কৌতূহল অনুভব করেন?
– একটু আধটু কৌতূহল অবশ্য হয়।
– কোনো বাসায় আশ্রিত থেকে সেই বাসার মেয়ের প্রতি কৌতূহল বোধ করাটা ঠিক না।
সজল এই আচমকা আক্রমণের কোনো অর্থ খুঁজে পায় না। সে খুবই অপমানিত বোধ করে। নেলী হেসে ওঠে।
– রাগ করলেন নাকি?
– জ্বি না।
– আমি ঠাট্টা করছিলাম। উঠুন, ফেরা যাক। বেলা হয়ে যাচ্ছে।
ফিরতি পথে কোনো কথা বললো না নেলী। সজল নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলো। বাসার সামনে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল নেলী।
– সত্যি করে একটা কথা বলবেন?
– কি কথা?
– আমাদের প্রতি কি আপনার কোনো অভিযোগ আছে?
সজল ম্লান মুখে বললো– এই প্রশ্ন করে অযথা আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন?
– দুঃখিত। প্রশ্নটা করা আমার উচিৎ হয়নি। আপনি কিছু মনে করবেন না যেন।
গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো নেলী। একবারও পেছন ফিরে তাকালো না। বিমূঢ় দৃষ্টিতে মেয়েটাকে অনুসরণ করলো সজল। এমন অদ্ভুত মেয়ে সে আগে কখনও দেখেনি।

ছয়

এই বাড়ির একটা নিয়ম হচ্ছে, সবাই একসাথে নাস্তা করা। চঞ্চল অবশ্য এই সব নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা করে না। সে প্রায়ই বাসায় থাকে না। সজলের কাছেও ব্যাপারটা ভালো লাগে না, সবার সাথে এক টেবিলে খেতে বসতে রীতিমতো সংকুচিত বোধ করে সে। কিন্তু ফাঁকি দেবারও উপায় নেই। টেবিলে বসেই তাকে ডাকাডাকি শুরু করবেন সোলায়মান চাচা। তাকে বোঝা দায়। ভদ্রলোককে কখনো কোমল কখনো অত্যন্ত কঠোর মনে হয়।

– সজল! সজল! ডাইনিংরুম থেকে চেঁচালেন সোলায়মান। শিরিন বিরক্ত হলেন। –এতো ডাকাডাকি করার কি আছে? টেবিলে নাস্তা দেওয়া হয়েছে, এসে খেয়ে যাবে।

– নাহ্ ছেলেটোকে তুমি দেখি সহ্যই করতে পারো না। গরিব বাবা-মার ছেলে, বহু কষ্টে ডিগ্রি পাশ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, ওর মধ্যে বড় হবার ইচ্ছা আছে। ওর সাথে সবার আরেকটু ভালো ব্যবহার করা উচিৎ।

– ওর সাথে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করা হচ্ছে।

সোলায়মান কথা বাড়ালেন না। বাইরের কেউ এই বাসায় এসে স্থায়ী আসন গেড়ে বসুক এটা শিরিন পছন্দ করে না।

সজল হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢোকে। –ডাক দিলেন চাচা?

– হ্যাঁ বাবা। নাস্তা খেয়ে নাও।

নিঃশব্দে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে সজল। তার দিকে প্লেট এগিয়ে দিলেন শিরিন।

– তোমার চাকরির কতদূর কি হলো?

– জ্বি, এখনো কিছু হয়নি।

– হয়নি, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। হবার কোনো আশা আছে কিনা সেটাই জানতে চাইছি।

উত্তরটা দিলেন সোলায়মান। মৃদু হেসে বললেন – হবে, হবে, কারখানার ঝামেলাটা মিটে গেলেই কোথাও এক জায়গায় লাগিয়ে দেবো ওকে। যে কোনো কাজেই শাইন করতে পারবে ও। কি বলো সজল?

– জ্বি পারবো।

লিমা মুখ টিপে হাসলো। – আপনি বেশ আজব মানুষ! যে যা বলে তাতেই 'জ্বি'।

হো হো করে হেসে উঠলো স্বপ্নিল। – বেচারাকে আর লজ্জা দিও না। এমনিতেই ওর চালচলন দেখলে মনে হয় একপাল বাঘ ভাল্লুকের সাথে বাস করছে, তারপর যদি এই রকম কথা বলো, তাহলে আজই বাক্স পেটরা গুছিয়ে রওনা দেবে, হাঃ হাঃ–

হেসে ফেললো সজল। এই লোকটার মুখের কোনো লাগাম নেই। যা-তা বলে।

নেলী গম্ভীর মুখে বললো – একটা কথা বলবো বাবা?

– অবশ্যই। বল কি জানতে চাস?

– তোমার কারখানায় শুনলাম বেশ গ-গোল হচ্ছে। তুমি তো আমাদেরকে এসব ব্যাপারে কিছুই বলো না। কাজটা কিন্তু অনুচিৎ। সংসারের সব ব্যাপারেই আমাদের জানার অধিকার আছে্।
– তা তো নিশ্চয় আছে। কিন্তু যে ব্যাপারে তোমাদের কিছু করার নেই, তা জেনেই বা কি লাভ?
– মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েও তো তোমার কোনো লাভ নেই, তবুও তুমি কাগজে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওখানকার খবর পড়ো। কেন বাবা?
সোলায়মান হাসলেন। – তোর যুক্তিটা মা খুব ভালো হয়নি। ব্যবসায়ী মানুষদেরকে যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারে খুব বেশি মাথা ঘামাতে হয়। যাই হোক তুই কী কী জানতে চাস বল। আমি আমার সাধ্য মতো উত্তর দেবো।
– শ্রমিকেরা আসলে কি চাইছে?
– কি আবার চাইবে! সেই পুরানো কচ্‌কচানি। এটা করো, সেটা করো। পুরো ঘটনাটাই আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র। কারখানার হাতে গোনা কয়েকটা লোক ক্ষেপিয়ে তুলছে অন্যদেরকে। লম্পট, মাতালের দল।
স্বপ্নিল তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করলো– না বাবা, তোমার কথাটা আগাগোড়া ভুল। এটা মোটেই কোনো ষড়যন্ত্র না। এটা ওদের চাহিদার বহিঃপ্রকাশ।
ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন সোলায়মান। – এই ব্যাপারে আমি তোমার সাথে আলাপ করতে চাই না। তাছাড়া, সব কাজে সবার মাথা না ঘামানোই ভালো। নসু, রাজীবকে গাড়ি বের করতে বল।
ডাইনিংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন সোলায়মান। রুষ্ট মুখে স্বপ্নিলের দিকে ফিরলেন শিরিন।
– কথাগুলো এভাবে না বললেও চলতো,স্বপ্ন।
– না মা, চলতো না। বাবা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন না। তোমরা কিছু না বললেও আমি এটা সহ্য করবো না।
ঠোঁট বাঁকালো নেলী।
– তুই করবিটা কি শুনি?
– কি করবো মানে?
– মানেটা তুই ভালোই জানিস। অকর্মা কোথাকার! ঘরে বসে খাচ্ছিস-দাচ্ছিস আর বউয়ের সাথে খুনসুটি করছিস। তোর কাজ বলতে তো এই।
হাসতে হাসতে বিষম খেলো লিমা। সজল মুখে হাত চাপা দিলো। তড়াক্ করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো স্বপ্নিল।
– কথাবার্তা একটু সামলে বলবি ছুঁড়ি। নইলে পিটিয়ে তক্তা বানাবো।
–এহ রে আমার পালোয়ান। ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে, তার আবার আস্ফালন।
লিমা পেট চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো– দোহাই নেলী, চুপ করো। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাচ্ছে।
সজল দৌড়ে পালালো। শিরিন আরও বিরক্ত হয়ে কামরা ছাড়লেন। ছেলেমেয়েগুলোর মতিগতি বোঝা দায়। এই ঝগড়া করছে তো এই হাসছে, খানিকক্ষণ পরেই আবার কেঁদেকেটে আকুল। এক একটা বদ্ধ উন্মাদ।
সজল নিজের ঘরে বসে ছিলো। শরৎচন্দ্র রচনাবলীর একটা খ- জোগাড় করেছে ও, সেটাতে মনোযোগ বসানোর চেষ্টা করছিলো। স্বপ্নিল সটান ভেতরে ঢুকে পড়লো।
– এই সজল কি করছো?
– জ্বি, কিছু না।
– কিছু না বলছো কেন? তুমি তো বই পড়ছো।
– জ্বি, হ্যাঁ।

– অবশ্য গল্পের বই পড়াটা কোনো কাজ নয় । আসলে ঘরে বসে নাক না ডাকিয়ে চলো একটু শ্রমিক পাড়া থেকে ঘুরে আসি । সরেজমিনে তদন্ত না করলে কখনো আসল অবস্থা বোঝা যায় না । কি বলো?
– জ্বি!
– কি ব্যাপার তুমি অমন ভড়কে গেলে কেন? আরে, তোমার ভয় কি? আমি সাথে থাকলে তোমাকে কেউ কিছু বলবে না । আরে, আমরা হলাম গরিবের বন্ধু, যেখানেই দুর্বলের উপর নির্যাতন হবে সেখানেই আমাদের ছুটে যেতে হবে । কি বলো? তখন আর কেউ গলা উঁচিয়ে বলতে পারবে না যে এই ব্যাটারা কোনো কাজ করে না । হাঃ হাঃ ... চলো ।
সজল খুবই বিপদে পড়লো । এই লোক একটা পাগল বিশেষ । তার সাথে যোগ দেবার কোনো অর্থ হয় না । সে করুণ মুখে বললো –স্বপ্নিল ভাই, আমার যেতে কোনো অসুবিধা নাই । কিন্তু আজ সকাল থেকেই পেটটা বড় ট্রাবল দিচ্ছে–
স্বপ্নিল গম্ভীর হয়ে পড়লো । –তুমি খুবই ভীতু মানুষ । তোমার ট্রাবলটা হৃৎপি-, অন্য কোথাও নয় । যাই হোক, যাবে না সেটা সরাসরি বললেই চলতো । আমাকে ভয় পাবার কিছুই নেই । আমি অন্যের উপর কখনো জোর খাটাই না ।
স্বপ্নিল বেরিয়ে গেলো । সজলের মন খারাপ হয়ে গেছে । তাকে কেউ কখনো কাপুরুষ বলেনি । প্রয়োজনে সাহসী হয়ে উঠতে সে কখনো কার্পণ্য করেনি । একা পাঁচজনের সাথে লড়েছে, সাঁতার না জেনেও ছোট ভাইকে বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছে– এমনি আরো দু'একটি উদাহরণ সে এখনই স্মরণ করতে পারে । তাকে কাপুরুষ বলা খুবই অন্যায় ।
সজল শরৎচন্দ্রকে একপাশে সরিয়ে রাখলো । এখন কোনো কিছুতেই মন বসবে না ।

সাত

চঞ্চলকে দেখেই লম্বা সালাম দিলো আলবার্ট ।
– আস্সালামু আলাইকুম, ভাইজান ।
কড়া দৃষ্টিতে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত মাপলো চঞ্চল ।
– তুমি না খৃস্টান?
– জ্বি, জ্বি । তা তো বটেই ।
– তাহলে সালাম দিচ্ছো কেন?
একগাল হাসলো আলবার্ট । –আরে ভাইজান, সালামের আবার ধর্ম কি? আপনাকে দেখে বড় আনন্দ হলো তাই আশীর্বাদ করলাম ।
সামান্য প্রীত হলো চঞ্চল । বাইরে থেকে লোকটাকে যতোটা অকালকুষ্মা- মনে হয়, আদতে তা নয় । মাথা ভরা বুদ্ধি ।
– কী কী রেঁধেছো আজ?
– অনেক কিছু ভাইজান । মুরগির রোস্ট, খাসীর মাংসের ভুনা, কৈ মাছের দোপেঁয়াজো–
লিমা নিচে নামছিলো, চঞ্চলকে দেখেই চিৎকার করে উঠলো– এই যে মশাই, এতোদিন পর এই হতভাগাগুলোকে স্মরণ হলো বুঝি?
হেসে ফেললো চঞ্চল । মেয়েটা সুযোগ পেলেই ওকে খোঁচাবে । – তোমার পাগলটা কোথায়?

– ভিসিআর -এ শ্রীদেবীর ছবি দেখছে। মেয়েটার আগা-পাশ-তলার এমন প্রশংসা শুরু করলো যে পালিয়ে বাঁচলাম। এই আলবার্ট, অমন হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছো কেন? যাও, নসুকে টেবিল সাজাতে বলো।
দু'হাত কচলিয়ে বেশ বিনীত একটা ভঙ্গি করে চলে গেলো আলবার্ট। লিমা বিরক্ত মুখে বললো, খুব ধড়িবাজ লোক। সুযোগ পেলেই মুখের দিকে ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে।
- প্রেমে পড়ে গেছে বোধ হয়।
ধাঁই করে চঞ্চলের পিঠে একটা কিল বসালো লিমা।
– খুব ইয়ার্কি শিখেছো! চলো, মা তোমার জন্য খুব দুশ্চিন্তায় আছেন।
– মিথ্যা বলো না। মা আমার জন্য কখনই চিন্তা ভাবনা করে না।
– হ্যাঁ, তোমাকে বলেছে।
শিরিন চুপচাপ শুয়েছিলেন। তাঁর শরীরটা ভালো নেই, শরীরে বয়োঃবৃদ্ধির নানান উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। চঞ্চলকে দেখে অন্য পাশে ফিরে শুলেন।
চঞ্চল নরম গলায় বললো– কেমন আছো মা?
– এই তো, আল্লাহ যেমন রেখেছেন।
লিমা ফিসফিসিয়ে বললো– বলেছিলাম না!
শিরিনের পাশে বসলো চঞ্চল। – মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?
– না বাবা। তোমার উপর রাগ করার অধিকার তো আমার নেই। তুমি এখন বড় হয়েছো, নিজেরটা নিজেই ভালো বোঝ।
– মা, একটা কথা বলবো?
– বলো।
–ভাবছি বদভ্যাসগুলো ছেড়ে দেবো।
শিরিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। – এই কথা এর আগে বহুবার বলেছো।
– এইবার সত্যিই ছাড়বো, মা।
– ছাড়তে পারলে তো ভালোই। এখন যাও। আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবো।
নিঃশব্দে উঠে পড়লো চঞ্চল। আজকাল মা তার সাথে খুবই শীতল ব্যবহার করেন। অথচ ছোটবেলায় সেই নাকি মায়ের সবচেয়ে প্রিয় ছিলো। মা খুবই অভিমানী। তার একমাত্র অস্ত্র শীতলতা।
বাইরে বেরিয়েই চঞ্চলের জামার কলার খামচে ধরলো লিমা।
– সত্যিই ছাড়বে এবার?
কৌতুক উপচে পড়লো চঞ্চলের চোখেমুখে। – কেন, যদি ছাড়ি তবে কি ভাইয়াকে ছেড়ে আমার গলাতেই ঝুলে পড়বে?
ঘুষি পাকালো লিমা। – এই ফাজিল মুখ সামলে কথা বলবে।
– সারেন্ডার, সারেন্ডার। এখন চলো, ভাইয়ার সাথে আমার কিছু কথা আছে।
শ্রীদেবী মিঠুনের সুপার ডিস্কো নাচটা বেশ ভালো লেগে গেছে স্বপ্নিলের, বার বার পিছু টেনে দেখছে। এই নিয়ে চার অথবা পাঁচবার হলো। চঞ্চলকে দেখেই হুঙ্কার ছাড়লো সে– আরে ছোট সাহেব দেখি। বয়, বয়। মারাত্মক ড্যান্স হচ্ছে। শ্রীদেবীর ফিগারটা দ্যাখ,মাইরি, একেবারে খাসা। নাচটা আবার প্রথম থেকে দেই, কি বলিস?
– তার চেয়ে ক্যাসেটটাই গিলে খেয়ে ফেলো না, ঝামেলা চুকে যায়। লিমা ফোড়ন কাটলো।
– হ্যাঁ, তা তো বলবেই। শ্রীদেবীকে দেখে তোমার হিংসে হয় এটা আমি বেশ জানি।
– ঘোড়ার ডিম জানো তুমি!

চঞ্চল গম্ভীর মুখে বললো– ভাইয়া। ঐ ঘ্যাচঘ্যাচানি বন্ধ করো। কিছু কথা আছে তোমার সাথে।
– আরে, কাকে ঘ্যাচঘ্যাচানি বলছিস তুই! জানিস, শ্রীদেবী মিঠুন জুটি এখন বোম্বের হট কেক।
– না জানি না। এবার দয়া করে ওটা বন্ধ কর।
বিরক্ত মুখে বন্ধ করলো স্বপ্নিল। – বল, কি বলবি।
লিমার দিকে ফিরলো চঞ্চল। –ভাইয়ার সাথে এখন আমার একটা ঝগড়া হবে। তুমি না থাকলেই ভালো।
শ্রাগ করলো লিমা। –ঠিক আছে, যাচ্ছি। তবে ফার্স্ট এইডের প্রয়োজন হলে ডেকো।
লিমা চলে যেতে কড়া চোখে স্বপ্নিলকে পরখ করলো চঞ্চল।
– কারখানায় গিয়েছিলে কেন?
– কেন মানে? বাবা ওদের ন্যায্য দাবি মানবে না কেন?
– সেটা বাবার ব্যাপার। তুমি কেন গিয়েছিলে?
– লতিফ, অনিরুদ্ধের সাথে দেখা করতে।
– কি বললো ওরা?
– দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাবে।
– তুমি কি বুদ্ধি দিলে?
– বললাম, চালিয়ে যা।
অধৈর্য ভঙ্গিতে চুলে হাত বোলালো চঞ্চল। –আচ্ছা ভাইয়া, তোমার কি কোনোদিনও একটু বাস্তব বুদ্ধি হবে না?
তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো স্বপ্নিল। –ওরে আমার বীর বাহাদুররে, বুদ্ধির গুলি খেয়ে এসেছেন। বেকুব নেশাখোর।
– মুখ খারাপ করো না ভাইয়া। যা বলি শোন।
– বল বল। মহামানবের মহৎ বাণী শুনে জীবন সার্থক করি।
– লতিফকে তুমি কতটা চেন?
– ওকে বেশি চেনার দরকারটা কি? সে ব্যাটাকে আমি দুলাভাই বানাবো নাকি?
– দরকার আছে। কারণ ও একটা আস্ত জোচ্চোর। এবারের ধর্মঘটের পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। সেকুল এন্টারপ্রাইজের কাছ থেকে টাকা খেয়েছে লতিফ।
চোখ ছোট ছোট করে ফেললো স্বপ্নিল। – তুই জানলি কি করে?
– কেন, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?
ইতস্ততভাবে নড়েচড়ে বসলো স্বপ্নিল। চঞ্চল কখনো বাজে কথা বলে না। –অবিশ্বাস করার কি আছে।
– সেক্ষেত্রে কোন সূত্রে জানলাম সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তুমি এসবের মধ্যে মোটেই জড়াবে না, এটা আমার অনুরোধ। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মানতে হবে ঠিকই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অন্যের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হবে।
একমনে গাল চুলকালো স্বপ্নিল। –কথাটা ঠিক। কিন্তু লতিফ হারামিটা তলে তলে এতো ঘোড়েল তা তো জানতাম না। শালার ব্যাটাকে একটা রাম ধোলাই দেয়া দরকার।
– না, কোনো দরকার নেই। ওটা বাবার ব্যবসা, তিনি যা ভালো বুঝবেন করবেন।
চঞ্চল চলে যেতেই ভিসিআর চালিয়ে দিলো স্বপ্নিল। বিষয়টা একটু জটিল। এটা নিয়ে পরে চিন্তা করা যাবে।

আট

খাবার টেবিলে সজলকে দেখা গেলো না। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেও কিছু বললেন না শিরিন। ছেলেটাকে তার অপছন্দ নয়, কিন্তু ডাকাডাকি করতে সংকোচ হলো।
লিমা বললো– সজল ভাইকে দেখছি না।
শিরিন নিস্পৃহ মুখে বললেন– তোমরা শুরু করো।
স্বপ্নিল ডাইনিংরুমে ঢুকেই হৈচৈ শুরু করলো। –আরে সজল কোথায়? এই সজল, সজল! বুদ্ধুটা আমার উপর ক্ষেপে টং হয়ে আছে।
অবাক হয়ে তাকালো লিমা। – কেন, তুমি আবার ওকে কি বলেছো?
– তেমন কিছু না। খুব ভদ্র ভাষায় কাপুরুষ বলেছি। ভীষণ সেন্টিমেন্টাল ছেলে। সামান্যতেই আঘাত পায়। আচ্ছা, আমি বরং ডেকে নিয়ে আসি।
নেলী বিরক্ত হলো। –অতো ডাকাডাকির কি আছে?
–তুই ছুঁড়ি এসবের কি বুঝবি? তোর মনটন বলে তো কিছু নেই।
স্বপ্নিল দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলো। শিরিন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– ছেলেটা বরাবরই আধ-পাগলা থেকে গেলো।
শাশুড়ির অনুশোচনার ভাবটুকু ভালো লাগলো না লিমার।
পাগল হোক আর যাই হোক, এমন মানুষ ক'টা হয়? পরিবর্তনটুকু চঞ্চলের চোখ এড়ালো না। সে সুবোধ স্বরে বললো– আহ্ মা, কার সামনে কি বলো খেয়াল থাকে না। ভাবী দুঃখ পাচ্ছে।
চোখ গরম করলো লিমা। –তোমাকে সব কিছুতে মাতবারি করতে কে বলেছে?
– আহ্ ক্ষেপছো কেন? মা ভুল করে বলেছে।
– আবার?
চড় বাঁচাতে কাত হলো চঞ্চল, নেলীর মাথায় মাথা ঠুকে গেলো। নেলী বিতৃষ্ণ ভঙ্গিতে ধমকে উঠলো– খাবার সময় এসব কি জ্বালাতন। তোদের ভাবী-দেবরের রসালাপটা বাইরে গিয়ে করতে পারিস না?
শিরিন কঠিন স্বরে বললেন –নেলী, এসব কি যা-তা বলছো।
–যা-তা নয় মা, সব সময় এসব দেখতে ভালো লাগে না।
লিমা আহত দৃষ্টিতে নেলীর দিকে তাকিয়ে থাকলো। মেয়েটা হঠাৎ হঠাৎ এমন অদ্ভুত ব্যবহার করে কেন?
নির্বিকারে চোখ টিপলো চঞ্চল। –নেভার মাইন্ড ভাবী। ওকে এমন জায়গায় বিয়ে দেবো, যেখানে ওর গ-া গ-া যুবক দেবর থাকবে। রসালাপের আসল মজাটা টের পাবে।
মুখ বাঁকালো নেলী। –সবাই তোর লিমা না।
লিমার কান্না পাচ্ছে। উঠে যেতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু উঠলো না। এসব ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখানো উচিৎ নয়। সজলকে এক রকম বগলদাবা করে ফিরে এলো স্বপ্নিল। –অভিমান আর কাকে বলে। কখন কি বলেছি না বলেছি তাই মনে রেখে উনি মন শুকনো করে বসে আছেন। পাগল কোথাকার, বসো।
প্রচ- অস্বস্তি নিয়ে বসে পড়লো সজল। কারো দিকে মুখ তুলে চাইতে পারলো না। তার দিকে প্লেট এগিয়ে দিলেন শিরিন। মৃদুস্বরে বললেন– স্বপ্নিল তোমাকে কী বলেছে জানি না, তবে তুমি ওর কথায় কিছু মনে করো না। ও কেমন সে তো জানোই।
নেলী তাতানো স্বরে বললো– এই কথা দেশের কারো জানতে বাকি আছে নাকি? বদ্ধ উন্মাদ কোথাকার।

চোখ পিট্‌পিট্‌ করে তাকে দেখলো স্বপ্নিল । –এই ছুঁড়ি তুই সব সময় আমার পেছনে লেগে থাকিস কেন রে?
–বাজে কথা বলিস না । তোর পেছনটা এমন কিছু সুন্দর নয় যে লেগে থাকতে হবে ।
চোখ জোড়াকে আর একটু ছোট ছোট করে হাসতে লাগলো স্বপ্নিল ।
–এই ভাইয়া, অমন শয়তানের মতো হাসছিস কেন?
–ইদানিং তোর মন মেজাজ কেন এতো খারাপ যাচ্ছে তার কারণটা বোধ হয় আমি ধরতে পেরেছি ।
– কেন? থমথমে মুখে জানতে চাইলো নেলী ।
– তোর ইয়ে, ঐ কি যেন বলে, ওখানে গ-গোল দেখা দিয়েছে বোধ হয় ।
ভাতের থালাটিকে স্বপ্নিলের মুখের উপর ছুড়ে দিয়ে টেবিল ছাড়লো নেলী । নসু দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে কিছুই না বুঝে বিশুদ্ধ আনন্দে হাসছিলো, তার দুইগালে দুই থাপ্‌পড় বসিয়ে ঘর ছাড়লো সে । হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলো স্বপ্নিল । শিরিন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন –হাসিস্‌ না । কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয়, এই সামান্য জ্ঞানটাও তোর নেই ।
লিমা রুক্ষস্বরে বললো– কোনদিন হবেও না ।
সজল খুবই অস্বস্তি বোধ করছে । বসে থাকাটাও বিব্রতকর, উঠে যাওয়াটাও অসম্ভব । সে একদৃষ্টিতে প্লেটের আল্পনা দেখতে লাগলো ।

নয়

অনেক রাত । স্বপ্নিল ঘুমিয়ে পড়েছে । লিমার ঘুম আসছে না । সে অন্ধকার ছাদে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে । নেলী আজ তাকে প্রচ- আঘাত করেছে । চঞ্চল তার সমবয়েসী, যে কারণে সহজ একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে । সেটাকে এমন নোংরা চোখে দেখার কোনো কারণ নেই । চোখের পানি মুছলো সে । জীবনটাকে যতটা সহজ সরল মনে হয় আসলে তা নয় । ভালো হয়ে চললেও প্রতিনিয়ত প্রিয়জনদের অর্থহীন আঘাত সহ্য করতে হয় । তার খুব কষ্ট হচ্ছে ।
নিঃশব্দে ছাদে উঠে এলো নেলী । –ভাবী ।
লিমা চমকালো কিন্তু উত্তর দিলো না । তার পাশে এসে দাঁড়ালো নেলী । –আমার কথায় কিছু মনে করো না ভাবী । ক'দিন ধরে আমার কি যে হয়েছে, যা মুখে আসছে তাই বলছি ।
লিমা এবারও প্রত্যুত্তর দিলো না । নেলী কোমলভাবে তার হাত চেপে ধরলো । –ভাবী আমার উপর রাগ করে থেকো না । ছোট ভাইয়ার সাথে তোমার কেমন সম্পর্ক সেটা আমি ভালো করেই জানি । তবুও ওভাবে কেন যে বললাম আমি নিজেও জানি না ।
লিমা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো– তুমি আমার সম্বন্ধে আর কখনো এভাবে কথা বলবে না । আমার খুব খারাপ লাগে ।
– তোমার মাথা ছুঁয়ে বলছি ভাবী, আর কখনো বলবো না ।
মৃদু শব্দে হাততালি দিলো চঞ্চল । –বিরক্ত করলাম না তো? বেশ জমছিলো কিন্তু নাটকটা ।

লিমা কান্নাভেজা চোখে হেসে উঠলো। –শয়তানটা এখানেও এসেছে।
– না এসে থাকতে পারলাম না। আমার প্রিয় ভাবী রাতদুপুরে ছাদে কি করছে জানতে বড়ো ইচ্ছে হলো। তবে এই কুঝ্ঝটিকা বেগমকে এখানে দেখবো, সেটা অবশ্য আশা করিনি।
–প্লিজ ছোট ভাইয়া, আমাকে রাগাস্ না।
– তুই তো এমনিতেই সবসময় হট থাকিস।
–থাকলে থাকি তাতে তোর কি?
লিমা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছলো। –সারাদিন নেশাটেশা করে বেড়াবে, আর যতক্ষণ বাসায় থাকবে আমাদের দু'জনকে জ্বালাবে। এ ছাড়া ওর আর কোনো কাজ আছে নাকি?
–আছে ম্যাডাম। শিলা নামের আরেকটি মেয়েকেও মাঝে মাঝে জ্বালাতে হয়। নইলে আমারও ঘুম হয় না, তারও হয় না।
লিমা এই প্রসঙ্গে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো।
– চঞ্চল, তুমি কি জানো শিলার নাকি বিয়ে?
– আলবত জানি। আমাকে না জানিয়ে ও বিয়ে করবে তাই কখনো হয়।
অবাক হলো লিমা। –কি যা-তা বলছো? বিয়ে তো তোমাদের দু'জনারই করার কথা ছিলো।
– ছিলো, কিন্তু হচ্ছে না। কারণ আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তুমি ছাড়া আমি আর কারো পাণি গ্রহণ করবো না। এখন ভাইয়ার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা।
নেলী হেসে ফেললো। –দেখছো ভাবী, বাঁদরটাকে আষ্কারা দিয়ে কেমন মাথায় তুলেছো।
– সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ফাজলামি রাখো চঞ্চল। সত্যি করে বলো তো তোমাদের মধ্যে কি ঝগড়াঝাটি হয়েছে? শিলা গতকাল রাতে ফোন করেছিলো, গলা শুনে মনে হলো বেশ কান্নাকাটি করেছে।
–ভালো লক্ষণ। এ রকম আরো দু'চার দিন কান্নাকাটি করলে আমার স্মৃতি ধুয়ে মুছে বিলকুল সাফ হয়ে যাবে।
–মানে? তুমি কি ওকে রিফিউজ করছো?
–একরকম।
–কেন?
– আমি ভেবেচিন্তে দেখেছি, এসব সংসার-টংসার আমাকে দিয়ে হবে না। খামাখা মেয়েটাকে কষ্ট দেয়া।
নেলী রাগী গলায় বললো– প্রেম করবার সময় খেয়াল ছিলো না?
–ওসব তো আর বলে কয়ে হয়নি। হঠাৎ হয়ে গেছে।
লিমা বললো– কিন্তু, তোমরা তো অনেক দূর এগিয়েছিলে।
–ও নিজেই আমাকে সুযোগ দিয়েছিলো কেড়ে তো নেইনি।
–যত্তোসব। স্যান্ডেলে চট্পট্ শব্দ করতে করতে চলে গেল নেলী।
লিমা চঞ্চলের হাত চেপে ধরলো– এখনো সময় আছে চঞ্চল। ভালো করে ভেবে দেখো। শিলাও কষ্ট পাবে, তুমিও কষ্ট পাবে। কি দরকার এই খামখেয়ালীপনার?
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো চঞ্চল। –তুমি তো আমার সবই জানো ভাবী। কেমন যেন হয়ে গেছি আমি। ইচ্ছে থাকলেও স্বাভাবিক হতে পারছি না।
–এখনও সময় আছে। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের মতো হয়ে যাও।
– ছাড়বো, সবই ছাড়বো। কিন্তু সে জন্য একটি ত্যাগ দরকার। আমি সেই ত্যাগ স্বীকার করছি। শিলা দুঃখ পাবে জানি, কিন্তু আমার সাথে বিয়ে হলে ও আরো বেশি দুঃখে থাকবে।

চঞ্চলের কণ্ঠে গভীর বিষণ্নতা ছিলো। লিমা কেঁদে ফেললো। –তুমি এমন কেন চঞ্চল? যখন সহজ স্বাভাবিক থাকো তখন তোমাকে দেখলে মন জুড়িয়ে যায়, কিন্তু তবুও তুমি আমাদের থেকে আলাদা, একদম অন্য রকম। মাঝে মাঝে তোমাকে আমার অচেনা মানুষ মনে হয়।
চঞ্চল কিছু বলে না। শিলার কথা মনে পড়ে যায়। শিলা কি এই মুহূর্তে বালিশে মুখ গুঁজে তার চঞ্চলের জন্য কাঁদছে? হয়তো হ্যাঁ, হয়তো না। তাতে আর কিছুই এসে যায় না।

দশ

দরজায় টোকা শুনেই সজল বুঝলো, নেলী। তাকে দেখে স্মিতভাবে হাসলো নেলী। –হাঁটতে যাবেন?
–নিশ্চয়। আপনি এগিয়ে যান আমি আপনাকে ধরে ফেলবো।
–তাড়াতাড়ি আসবেন।
নেলীর মেজাজ আজকে খুবই ভালো। মাঝে মাঝে দু'একদিন এমন হয়। কেন যেন সব কিছুই ভালো লাগতে থাকে। একটা কাক বিশ্রী স্বরে ডাকছে, এই ব্যাপারটাও তাকে চমৎকৃত করছে। সজল তার পাশাপাশি না হেঁটে একটু পিছিয়ে যাচ্ছে, এতেও বেশ মজা লাগছে।
–সজল।
–জ্বি, বলুন।
– আজকে আমার সাথে যে কোনো বিষয়ে আলাপ করতে পারেন আপনি। আমি কিচ্ছু মনে করবো না।
সজল হেসে ফেললো।
নেলী অবাক হয়ে বললো– হাসছেন কেন?
–আপনি খুব খেয়ালী মেয়ে। আপনার মেজাজ কখন যে কেমন থাকে বোঝার কোনো উপায় নেই।
–আমি নিজেই বুঝি না, অন্যে বুঝবে কি করে?
– একটা কৌতুক শুনবেন?
–ও মা, আপনি জোকস্ বলতে পারেন নাকি?
– পারি না। মাঝে মাঝে চেষ্টা করি। শুনবেন?
– বলুন না?
–একজন কৃষকের পা ভেঙে গেছে, তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার তাকে জিজ্ঞেস করলেন– তোমার পা ভাঙলো কি করে?
কৃষক বললো –হুজুর, বাড়ির চালা মেরামত করতে গিয়ে।
ডাক্তার বললো– কিভাবে তাই বলো।
কৃষক বললো–হুজুর পঁচিশ বছর আগে আমি এক বাড়িতে জায়গীর থাকতাম। একদিন রাতে মালিকের মেয়ে আমার ঘরে এসে বললো, আপনার কি কিছু চাই?
নেলী বললো– আপনার জোকস্টা অনেক বড় মনে হচ্ছে। থাক এখন। পরে কখনো শোনা যাবে। চলুন ঐ মোড়ের দোকান থেকে চা খাবো।
সজল নিজের উপরেই বিরক্ত হলো। আরেকটু ছোট দেখে কিছু বাছাই করা উচিৎ ছিলো। কিন্তু কৌতুকটা সে সদ্য সদ্য পড়েছে, খুঁটিনাটি সবকিছু মনে আছে। নেলী তাকে চুপচাপ থাকতে দেখে হেসে ফেললো।

–আপনি দেখছি সত্যিই খুব অভিমানী । আপনার জোকস্‌টা আমি পরে শুনবো । আপনার মন খারাপ করার কিছু নেই ।
– না, না আমি মন খারাপ করিনি ।
–মিথ্যে বলবেন না ।
ভাসমান একটি চায়ের স্টলের সামনে দাঁড়ালো নেলী । কমবয়সী দোকানী হাসি হাসি মুখে বললো– বহেন আফা । ফাস্ট ক্লাশ দেইখা চা বানাইয়া দিমু?
–না । খুব খারাপ করে দু'কাপ চা বানা । যেন অনেকদিন তোর চায়ের কথা মনে থাকে ।
ছেলেটা হাসতে লাগলো । – কি যে কন আফা । আমার দোকানের চায়ের সোয়াদই আলাদা । একবার খাইলে আবার আইবেন ।
নেলী ধমক দিলো– এতো বকবক করিস না । তাড়াতাড়ি চা দে ।
সে বেঞ্চিতে বসে পড়লো । শ্রমিক শ্রেণীর কয়েকজন বেঞ্চির অন্যপ্রান্তে বসে ছিলো, তারা সঙ্গে সঙ্গে স্বলজ্জ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো । নেলী অবাক হয়ে বললো– আপনারা উঠছেন কেন? বসুন বসুন ।
তারা কেউই বসলো না, মুখ উজ্জ্বল করে হাসতে লাগলো । সজল মৃদুস্বরে বললো– আপনার বোধ হয় এখানে চা খাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না ।
– কেন?
– বাসায় শুনলে রাগ করবেন সবাই ।
নেলী হাসতে লাগলো । – তাতে আপনার ভয়ের কি আছে? আমার জন্য আপনাকে বকুনি খেতে হবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন । এই ছোড়া চায়ে বেশি করে চিনি দিবি ।
– আচ্ছা আফা ।
– দুধও বেশি ।
– আচ্ছা আফা ।
শেষ পর্যন্ত সেই চা নেলী খেলো না । দু'ঢোক খেয়েই মুখ বাঁকিয়ে ফেললো । –এই ছোড়া, এ কি বানিয়েছিস? মুখে দেওয়া যায় না । চায়ে সরবত ।
–আফনেই তো কইলেন আফা ।
–চুপ্‌ । এই সজল, খাবেন না । এই চা খেলে পেট খারাপ করবে ।
– না আফা ।
– তুই চুপ কর । চা বানানোর কিছুই জানিস না তুই । আমি একদিন এসে তোকে শিখিয়ে দিয়ে যাবো ।
দাম মিটিয়ে দিলো সে । –চলুন, বাড়ি যাই ।
–চলুন ।
নেলী বাড়িতে ফিরলো না । লেকের পাশে বসে পড়লো । –বসুন । কিছুক্ষণ গল্প করি ।
সজল বললো– আজকে আপনি সত্যিই খুব ভালো মুডে আছেন ।
নেলী মুখ টিপে হাসলো । –সুযোগটা তো নিচ্ছেন না । এই চান্সে আমার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করুন না ।
সজল হাসতে লাগলো ।
– হাসছেন কেন?
– আপনি সবাইকে খুব আঘাত করার চেষ্টা করেন । ছেলেমানুষী ব্যাপার ।
– আমাকে ছেলেমানুষ বললেন । আপাতত ছেড়ে দিলাম । আর কখনো বললে একটা থাপ্‌পড় লাগিয়ে দেবো ।
সজল নিস্প্রভ হয়ে পড়লো । – সরি । আপনি রাগ করবেন আমি বুঝতে পারিনি ।

– আরে বাহ, আপনি মেয়েমানুষকে ছেলেমানুষ বলবেন, অথচ আমি রাগ করবো না!
নেলী অদম্য হাসিতে ফেটে পড়লো। সজলও হেসে ফেললো। মুগ্ধ চোখে মেয়েটাকে লক্ষ্য করছে সে। গত এক মাসে নেলীকে এতোখানি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর কখনো হাসতে দেখেনি সজল। হাসলে তাকে কি অদ্ভুত সুন্দর দেখায়।
ফিরতি পথে নেলী বললো– আমরা এখন থেকে প্রতিদিন ভোরে হাঁটতে বের হবো। ঠিক আছে?
–আমার কোনো অসুবিধা নেই।
–অসুবিধা আবার কিসের। আমার মতো সুন্দরী একটা মেয়ের সাথে বেড়াতে পারছেন, এটা তো আপনার সৌভাগ্য।
নেলী আবারও হাসিতে ফেটে পড়ে। সজল এবার বেশ সঙ্কুচিত হয়ে যায়। সব কথা সহজভাবে নেয়া যায় না। নেলী বললো– রাগ করলেন নাকি? রাগ করবেন না। সত্যি কথা শুনে কখনো রাগ করতে নেই।
– জ্বি না। রাগ করিনি।
নেলী হাসতে লাগলো।

এগার

শিলাকে দেখেই বিশাল একটুকরো হাসি দিলো নসু– আসেন আফা।
– তোর ছোট ভাইজান বাসায় আছে?
– জ্বে। আজ সকাল থেকে কোথাও যাননি। ডেকে আনবো?
– না। আমিই উপরে যাচ্ছি।
দ্রুতপায়ে উপরে উঠলো শিলা। ডানে লিমাদের ঘর, বাঁয়ে চঞ্চলের। ডানদিক থেকে পুরুষ কণ্ঠের তর্জন গর্জন ভেসে আসছে। নিশ্চয় স্বপ্নিল ভাই আবার ক্ষেপেছেন। হাসি চেপে চঞ্চলের ঘরে ঢুকলো শিলা। ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে চঞ্চল, ডেক সেটে সেতার বাজছে। খুকখুক করে কাশলো শিলা। ওকে দেখেই হাল্কা একটুকরো হাসি ছড়িয়ে পড়লো চঞ্চলের চোখে।
– কখন এলে?
–এক্ষুনি। কি করছিলে তুমি?
– যোগব্যায়াম।
–হঠাৎ?
– নেশা-টেশা ছেড়ে দেবো ভাবছি। সে জন্যে শরীর এবং মন দুটোকেই একটু শক্ত করছি।
মুখ ভ্যাঙ্গালো শিলা। –মিথ্যে কথা বলারও একটি সীমা থাকা উচিৎ।
– না, সত্যিই এবার ছেড়ে দেবো।
বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসলো শিলা। চঞ্চল মেঝে থেকে উঠল না।
– এভাবেই শুয়ে থাকবে নাকি?
– থাকি না। তোমার সামনে তো আর লজ্জা নেই।

– নেই কেন? ক'দিন বাদেই তো আমি পরস্ত্রী হয়ে যাবো ।
– সত্যিই তোমার বিয়ে?
–হ্যাঁ!
– কবে?
– এখনও দিনক্ষণ ঠিক হয় নি । কথাবার্তা চলছে ।
চঞ্চল কিছু বললো না দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো শিলা ।
– কিছু ভাবছো মনে হয় ।
– না ।
– এখনও সময় আছে । তুমি চাইলে আজ রাতেই আমাদের বিয়ে হতে পারে ।
একদৃষ্টিতে শিলাকে দেখলো চঞ্চল । –তুমি কি আমাকে সত্যিই এতোখানি ভালোবাসো?
– কতোটা ভালোবাসি জানি না । কিন্তু অন্য একজনকে ঠকাতে মন চাইছে না ।
একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো চঞ্চল ।
– কি ভাবছো?
– তোমাকে দেখলেই আমার ঘর বাঁধতে ইচ্ছে করে শিলা ।
–এমন নাটুকে ঢঙ্গে কথা বলছো কেন? বাঁধাবাঁধির কাজটা তো আমরা যেকোনো মুহূর্তেই সেরে ফেলতে পারি ।
– আমার মতো একটা উজবুককে সামলাতে পারবে?
ওর চোখে চোখ রাখলো শিলা । –সেদিনের চেয়ে অনেক নরম হয়েছো মনে হচ্ছে ।
সটান ভেতরে ঢুকে পড়লো নেলী । –গলা শুনেই বুঝেছিলাম শিলা'পা ছাড়া আর কেই বা । আজব মেয়ে তুমি বাবা, কি করে বুঝলে ছোট ভাই আজ বাড়িতে আছে?
শিলা হেসে ফেললো–মন বলছিলো যে ।
চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসলো নেলী । – তা, পটানো গেলো ছোড়াটাকে?
– আশা পাচ্ছি একটু-আধটু ।
– আমি বলি কি শিলা'পা, ব্যাটাকে স্ট্রেট কাজী অফিসে ধরে নিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে ফেলো । ল্যাঠা চুকে যাক ।
–কিন্তু তোমার ভাই যে কাজীর মাথা ভেঙ্গে পালিয়ে আসবে না তা জানবো কি করে?
নেলী হেসে উঠলো । – শক্ত করে ধরে রাখতে পারবে না?
ওদিকের গর্জন কিছুটা কমেছে । প্রথম সুযোগেই সরে পড়লো লিমা । শিলাকে দেখেই সে চমৎকৃত হয়ে গেলো ।
– কখন এলে শিলা? চিড়িয়া কি ধরা দিলো?
– ধরা দিয়েও যে দেয় না ভাবী ।
– দেবে । আমি তার আঁচ পেয়েছি । নিশ্চিন্তে ওদিকের সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দিতে পারো । এনাকে যতটা বিবাগী মনে হয়, ইনি বোধ হয় সত্যিই ততোটা নন ।
চোখ পাকালো চঞ্চল । – খুব পিছে লেগেছো ।
–খারাপ তো কিছু বলিনি । মুখে বলছো বিয়ে করবে না । ঘর সংসার আমার জন্য নয় । অথচ মনে মনে জপ করছো 'শিলা' 'শিলা'!
– হ্যাঁ, তোমাকে বলেছে!
– বলেছই তো । কি শিলা, বলেনি?
চঞ্চল স্পষ্ট বুঝলো, কাল রাতের ঘটনা সব ফাঁস হয়ে গেছে । দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো স্বপ্নিল ।

– চঞ্চল একটু শোন তো ।
– ভেতরে এসো না ভাইয়া ।
– না, সময় নেই । জলদি বাইরে আয় ।
খানিকটা অনিচ্ছা নিয়েই বেরিয়ে গেলো চঞ্চল ।
শিলা বললো– ভাবী, ও যেন খানিকটা নরম হয়েছে মনে হলো ।
– কিছু ভেবো না, বিয়ে ওকে করতেই হবে ।
হেসে ফেললো শিলা । – বেশ জীবন আমার । তিন বছর প্রেম করে বিয়ে করবো, তাও সাধতে সাধতে প্রাণ যায় ।
– বিয়ের পর মূড়া ঝাড়ু দিয়ে বেশ কটা দিয়ে দিও, তাহলেই শোধ হয়ে যাবে ।
সশব্দে হেসে উঠলো ওরা । চঞ্চল বিরক্তমুখে ভেতরে ঢুকলো ।
– পাগলামীরও একটা সীমা থাকা উচিৎ ।
লিমা উদ্বিগ্ন স্বরে বললো– কেন, ও আবার নতুন কোনো ফন্দি আঁটছে?
– বাবাকে কিভাবে শায়েস্তা করা যায়, তাই ভাবছে ।
– তোমাকে ডেকে কি বললো?
– জানতে চাচ্ছিলো ছেলে বাবার দু'খানা দাঁত ভাঙ্গলে বড়জোর ক'মাসের জেল হতে পারে ।
ঝট করে উঠে দাঁড়ালো লিমা । –বলো কি? কি সর্বনাশের কথা । শিলা, পরে কথা হবে । আগে পাগল ঠেকাই । হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলো সে ।
শিলা অবাক হয়ে বললো –এসব কি হচ্ছে?
নেলী ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো– পাগল ছাগলের কাজকর্ম । ঠিক ঠিকানা নেই ।
চঞ্চল শার্ট,প্যান্ট পরলো । – শিলা তুমি কি এখনই বের হবে?
– হ্যাঁ । কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছো?
– চলো গাড়িতে উঠে বলবো ।
পেছনের সীটে পাশাপশি বসলো দু'জন । শিলার হাত টেনে নিয়ে আঙুল মটকে দিতে লাগলো চঞ্চল ।
– ব্যথা লাগছে তো ।
– লাগুক না একটু ।
– যাবে কোথায়?
– মগবাজার । ড্রাইভারকে বলো ।
নির্দেশমতো গাড়ি ছোটালো ড্রাইভার ছেলেটা । শিলা বিষণ্ন দৃষ্টিতে চঞ্চলকে দেখলো । – তুমি না বললে এসব ছেড়ে দেবে?
সামান্য দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে চঞ্চল, চোখেমুখে ঈষৎ উত্তেজনার চিহ্ন । শিলার মধ্যমায় আলতো করে কামড় দিলো সে ।
– ঝট করে ছেড়ে দেয়া যায় না । শরীরে খিঁচুনী ওঠে । ধীরে ধীরে কমাতে হয় ।
– কোনো ভালো ডাক্তারের সাথে কথা বলো না । আজকাল তো এসবের ভালো চিকিৎসা হচ্ছে ।
– ডাক্তার লাগবে না । নিজের ইচ্ছাই যথেষ্ট ।
মগবাজারের একটা সরু গলিতে গাড়ি থামালো চঞ্চল । লাফিয়ে নিচে নামলো । প্রচ- অস্বস্তি বোধ করছে সে । শিলা উদগ্রীব হয়ে তার হাত চেপে ধরলো । –চঞ্চল ঐ সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দেই?
ঝট্ করে নিচু হয়ে শিলার ঠোঁটে চুমু খেলো চঞ্চল । –দাও । জাহান্নামে যদি যেতেই হয়, দু'জন এক সাথেই যাবো । দৌড়ে গলির অন্ধকারে বেরিয়ে গেলো সে ।

শিলা সুখ দুঃখের মাঝামাঝি একটা অনুভূতি নিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলো। ড্রাইভার ছেলেটা নতুন, তার নাম জনি। এই মহিলার কা--কারখানা তার কাছে প্রহেলিকার মতো মনে হলো। মিনিটখানেক পরে ইতস্তত স্বরে জানতে চাইলো –বাড়ি যাবে, আপা?
শিলা কোনো জবাব দিলো না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলো না জনি। তার নিজেরও রীতিমতো কান্না আসছে। তলপেটের চাপটা বিশ্রী আকার ধারণ করছে, এক্ষুনিই ঝাড়তে পারলে বাঁচা যেতো। ড্রাইভিং সিটে বসে ছটফট করতে লাগলো সে।

বার

পরদিন বেলা এগারটায় বুড়িগঙ্গার তীরে বস্তাবন্দী অবস্থায় লতিফকে পাওয়া গেলো। মৃত।

তের

সাব ইন্‌সপেক্টর তৌফিক আহমেদ। বয়সে তরুণ, টগবগে রক্ত। কেসটা হাতে পেয়েই সক্রিয় হয়ে উঠলো সে। খুনীদের ধরতেই হবে।
লতিফকে সনাক্ত করতে খুব একটা অসুবিধা হলো না। সোলায়মান নিজে এসে লাশ দেখে গেছেন।
–লোকটা ভালই ছিলো! দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছেন তিনি। ভদ্রলোককে পছন্দ হয়নি তৌফিকের। তার কথাবার্তায় এক ধরনের কৃত্রিমতার ছোঁয়া ছিলো। একটু তীক্ষ্ণস্বরেই প্রশ্ন করেছিলো সে –আপনার কারখানায় তো এই লোকের নেতৃত্বেই ধর্মঘট চলছিলো, তাই না?
সোলায়মান শান্তকণ্ঠে বলেছেন– আপনি নতুন এসেছেন, অনেক কিছুই জানেন না। কল-কারখানায় এরকম ধর্মঘট হরদম হয়। নেতৃত্বের ব্যাপারটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। লতিফও একজন সাধারণ শ্রমিক ছিলো।
কথা বাড়ায়নি তৌফিক। কিন্তু ভদ্রলোককে তার সন্দেহ হয়েছে। আজকাল এই ধরনের খুন-খারাবী অহরহ হচ্ছে। ব্যক্তি স্বার্থের সামনে মানুষের জীবনও নিতান্ত তুচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লতিফ সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজ-খবর করতে শুরু করলো সে।
দুপুর বারোটার দিকে ঘুম ভাঙালো স্বপ্নিলের। গত রাতে বিছানায় কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিলো, দেরিটা সেই কারণেই। হাত মুখ ধোয়া হতেই লিমাকে ডাকলো। গম্ভীর মুখে ভেতরে ঢুকলো লিমা।
– একটা দুঃসংবাদ আছে।
– আপাতত কোনো সংবাদ শোনারই ইচ্ছে নেই আমার। ঝট করে এক কাপ চা নিয়ে এসো।

আদেশ পালন করার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না লিমার মধ্যে। বিষণ্ন ভঙ্গিতে বিছানায় বসলো সে। অবাক হলো স্বপ্নিল।
– ব্যাপার কি! এমন উজবুক্কা পাটার মতো মুখ করে রেখেছো কেন?
– কারখানায় একজন শ্রমিক খুন হয়েছে। বুড়িগঙ্গায় লাশ পাওয়া গেছে।
– কি আবোল-তাবোল বকছো?
– আবোল-তাবোল বকছি না। একটু আগেই বাবা ফোন করে বাসায় জানিয়েছেন। বলেছেন, সাংবাদিকরা কেউ এলে আমরা যেন সাক্ষাৎকার না দিই।
– লাথ্থি মারো সাক্ষাৎকারে! বিদ্যুৎবেগে প্যান্ট-শার্ট পরলো স্বপ্নিল। জুতো পরার ধৈর্য নেই, চামড়ার স্যান্ডেলটা পায়ে লাগিয়ে ছুটলো।
লিমাও ত্রস্ত ভঙ্গিতে পিছু নিলো– এই, কোথায় যাচ্ছো তুমি?
– জাহান্নামে!
– তোমার দোহাই লাগে, যেও না।
– রাখো তোমার দোহাই। দেশের মানুষ সব খুন হয়ে যাবে আর আমি ঘরে বসে বসে আঙ্গুল চুষবো নাকি? একরকম জোরেই গেট পেরুলো স্বপ্নিল। রিকশা নিলো। পেছন থেকে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করলো লিমা, কানে নিলো না স্বপ্নিল। দুশ্চিন্তা ভারাক্রান্ত মনে গেট ধরে দাঁড়িয়ে থাকলো লিমা, পাগলটা কোথায় কি করে বসে কে জানে? ওকে বিশ্বাস নেই।
শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো তৌফিক স্বপ্নিলের বাল্যবন্ধু। পূর্ব পরিচয়ের সূত্রটা কষ্ট করে স্বপ্নিলকেই উদ্ধার করতে হয়েছে। সিক্স অথবা সেভেনে থাকতে এক ক্লাশে কিছুদিন পড়েছিলো তারা। সর্বসাকুল্যে আট-দশটির বেশি কথা হয়েছিলো কি না সন্দেহ। তৌফিক খুব চুপচাপ স্বভাবের ছিলো। সহজে কারো সাথে মিশতো না। এখন দেখলে স্বপ্নিলকে সে আদৌ চিনতে পারবে কি না বলা কঠিন।
তৌফিক ওকে অবাক করলো। মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই সে স্বপ্নিলকে চিনে ফেললো এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়ালো।
– স্বপ্নিল! কতোদিন পর দেখলাম তোমাকে। আছো কেমন? কি করছো? বিয়ে করছো? ছেলেমেয়ে কয়জন?
উপস্থিত সবাইকে সচকিত করে সশব্দে হেসে উঠল স্বপ্নিল। –তুমি দেখি আমাকে প্রশ্নের সাগরে হাবুডুবু খাইয়ে ছাড়বে। কোনটার উত্তর দেই?
তৌফিক হাসলো। –তুমি আজও আগের মতই রয়ে গেছো।
– না থেকে উপায় নেই দোস্ত। বউ যা একখানা পেয়েছি না, রাতদিন পাগল পাগল বলে আমার মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছে হাঃ হাঃ। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলো স্বপ্নিল। –তোমার কাছে একটা বিশেষ কারণে এসেছিলাম তৌফিক।
– সেটা আমি প্রথমেই বুঝেছি। ব্যাপারটা কি তাই বলো।
– ব্যাপারটা লতিফকে নিয়ে, সরি, মরহুম লতিফকে নিয়ে।
– মানে, আজ সকালে যার লাশ–
– হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো।
– কিন্তু ওর সাথে তোমার কি সম্পর্ক?
– সম্পর্ক সামান্যই। আমি মি. হাওলাদারের ছেলে।
তৌফিক নিজেও গম্ভীর হয়ে পড়লো। কলমের ডগা দিয়ে টেবিলে আনমনে কিছুক্ষণ খোঁচালো সে।
–কিছু মনে করো না স্বপ্নিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার সাথে কোনো রকম আলাপ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

স্বপ্নিল গলা নামিয়ে বললো –বাবা খুনের সাথে জড়িত আছেন বলে সন্দেহ করছো, তাই তো?
আলতো করে মাথা নাড়লো তৌফিক। – হয়তো।
–আরে ভাই, এই রকম ঘটাং মেরে গেলে কেন? আমি তো তোমাকে সাহায্য করতেই এসেছি।
–মানে!
–মানেটা অতি পরিষ্কার। আমারও সন্দেহ, বাবা এই ঘটনার সাথে যুক্ত। আমি চাই তুমি এই কেসটা ভালো মতো ডিল করো।
বিস্ফোরিত চোখে ওকে দেখলো তৌফিক। –ব্যাপারতো কিছুই বুঝছি না। তুমি কেন–
–না, বাবার সাথে আমার কোনো শত্রুতা নেই। আমি ন্যায় বিচার চাই। ব্যস।
স্বপ্নিলের কথাবার্তা হেঁয়ালীর মতো শোনালো তৌফিকের কাছে। স্বপ্নিলকে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এলো সে। আলাপটা আরেকটু নিভৃতে হওয়াই ভালো।
স্বপ্নিল বাসায় ফিরে দেখলো থমথমে পরিবেশ। ড্রয়িংরুমে ভিড় করে বসে আছে সবাই। বাবা-মা, ভাই-বোন, লিমা, সজল সবাই। সে ভেতরে ঢুকতেই সোলায়মান কড়া গলায় বললেন– স্বপ্নিল, কোথায় ছিলে তুমি?
– একটু গোয়েন্দাগিরি করছিলাম। কেন?
– দেশে পুলিশের অভাব নেই যে তোমাকে ঘরের কাজকর্ম ফেলে ইন্সপেক্টরের পিছুপিছু ঘুরে বেড়াতে হবে। এতে আমার সম্মানহানি হয়, সেটা বোঝ না?
– পেছনে পেছনে ঘুরছি তা কে বললো? তৌফিক আমার বন্ধু, তার সাথেই ছিলাম। তাছাড়া আমি কি করি, না করি সেটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার সাথে আপনার পুচ্ছদেশ ধরে টানা হ্যাঁচড়া করার কোনো সম্পর্ক তো দেখছি না!
– শাট আপ!
তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো স্বপ্নিল। ক্ষীপ্ত কণ্ঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, লিমা ছুটে এসে তার হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে গেলো। লিমাকেই ধমকালো স্বপ্নিল– হাত ছাড়ো।
– না, ছাড়বো না।
– ইয়ার্কি নাকি, এ্যাঁ! ছাড়ো হাত।
– মোটেই না। ঘরে চলো।
– তোমার জন্যই এতো কিছু। তুমি আমাকে কক্ষনো কিছু বলতে দাও না। বাবার এতো বড় সাহস আমাকে কিনা 'শাট আপ' বলে!
– ঠিক আছে, সব দোষ আমার। ঘরে গিয়ে আমাকে বকে দিও। হলো তো?
– ঘোড়ার আ-া হলো। আমাকে বলে 'শাট আপ!'
চোখমুখ লাল করে নিজের স্টাডিরুমে চলে গেলেন সোলায়মান। শিরিন বিরক্ত মুখে তাকে অনুসরণ করলেন। সজল অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলো, এবার দ্রুতপায়ে সরে পড়ার চেষ্টা করলো। নেলী ডাকলো, শুনুন।
– জ্বি।
– বসুন। আপনার সাথে কথা আছে।
সজলকে বাধ্য হয়ে বসতে হলো। চঞ্চল উঠে দাঁড়ালো।
– আমি উপরে যাই।
– ইচ্ছে হলে তুই বসতে পারিস, ছোট ভাইয়া।
– না থাক। তোরা কথা বল। চলে গেল চঞ্চল।
– সত্যি করে একটা কথা বলবেন? নেলীর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ অন্তরঙ্গতা ঝরে পড়লো।

– নিশ্চয় বলবো ।
– আমাদের প্রতি আপনার উঁচু ধারণাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই না?
– জ্বি না, তা হবে কেন?
– হচ্ছে, আমি বুঝতে পারি । কিন্তু আমার একটাই অনুরোধ, এইসব নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না । সব সংসারেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে । এগুলো কিছু না ।
সজল মৃদু স্বরে বললো– আপনি আমাকে অযথাই লজ্জা দিচ্ছেন ।
– না, অযথা নয় । আমার এই সব কথা বলার পেছনে অন্য কারণ আছে । ভাইয়া চিরকালই ক্ষ্যাপাটে, ওর মাথায় একবার একটা কিছু ঢুকলে সেটা সহজে যায় না । এই খুনের সমস্যাটা নিয়েও ও একটা ঝামেলা পাকাবে । হয়তো আপনাকেও সাথে নিতে চাইবে । আপনি কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এসবের সাথে যুক্ত হবেন না ।
– জ্বি না, আমি এসবের মধ্যে নেই । আমার একটা চাকরি দরকার ।
– চাকরিটাই বড় কথা নয় । কিছুই না বুঝে আপনি যেন একটা বিশ্রী ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়েন, আমি সেই চেষ্টাই করছি ।
– আপনার কথাগুলো আমার মনে থাকবে ।
– আর একটা অনুরোধ । বাবার ভরসায় না থেকে নিজেও চাকরির চেষ্টা করুন । আপনার ভেতর প্রচুর বুদ্ধিমত্তা আছে । নিজের চেষ্টায় আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন ।
– এবার থেকে চেষ্টা করবো ।
নেলী উঠে দাঁড়ালো । –যদি নিজে কিছু সত্যিই করতে পারেন, আমি খুব খুশি হবো ।
নেলীর চলে যাওয়াটুকু দেখলো সজল । এই অপূর্ব মেয়েটা তার জন্য ভাবছে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় ।

চৌদ্দ

উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করছিলেন সোলায়মান । শিরিন বিরক্ত হলেন ।
– এমন ছটফট করছো কেন? চুপচাপ বসো তো একটু ।
– বসতে আর দিচ্ছো কোথায় তোমরা? সারাটা দিন হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বাসায় এসে কোথায় একটু শান্তিতে কাটাবো, তা না, শুধু অশান্তি আর ফ্যাসাদ ।
– অশান্তিটা আবার কোথায় দেখলে?
– কোথায় দেখলাম মানে? তোমার ছেলেমেয়েগুলো কি আমাকে একদ- শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে? বড়টা বাপের পেছনে লেগেছে, ছোটটা গাজা ভাং খেয়ে বেড়াচ্ছে আর মেয়েটা পনের বছর বয়সে...
– থাক থাক । ওসব কথা এখন তুলে কি লাভ?

– তুলি কি সাধে? কিন্তু এভাবে আর কতদিন পারা যায়? ওদিকে কারখানায় গোলমাল, এদিকে বাসায় ঝামেলা, এর চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়া ভালো ছিলো ।
হেসে ফেললেন শিরিন । –হও না সন্ন্যাসী । মানা করছে কে?
সোলায়মানের ঠোঁটেও সেই হাসির ছোঁয়া লাগলো ।
– আমাকে তাড়াতে পারলে বেঁচে যাও মনে করেছ ।
– বাঁচিই তো?
স্ত্রীর পাশে বসলেন সোলায়মান । হাতে হাত রাখলেন । আজ বহু বছর হলো এই অধিকার তিনি সংরক্ষণ করছেন । হিসেব করতে গেলে গোলমাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে । বাবা-মার পছন্দে বিয়ে করেছিলেন, নববধূকে অপছন্দ হয়নি । সুখে দুঃখে কেটে গেছে অনেকগুলো বছর, আর যাই করুন এই মেয়েটার সাথে তিনি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি । এর কাছে এলেই তার সব মানসিকতার অদ্ভুত এক শান্তির প্রলেপ পড়ে । তিনি মৃদুস্বরে বললেন– সত্যিই বাঁচো?
মুখ ঝামটা দিলো শিরিন । –বললামই তো একবার । নাও, শুয়ে পড়ো । আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি ।
বাধ্য ছেলের মতো শুয়ে পড়লো সোলায়মান । –স্বপ্নিলটা বোধ হয় আমার উপর খুব রেগেছে ।
– পাগল ছেলে! ওর মাথার কি কোনো ঠিক আছে?
– একবার ডেকে কথা বলবো?
– থাক, এখন । কাল নাস্তার টেবিলে আলাপ করো ।
কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন সোলায়মান । শিরিনের হাতে জাদু আছে । তার ঘুম আসছে ।
– সজল রাতে খায়নি ।
– হ্যাঁ । ওর মনটা ভালো নেই । মায়ের শরীর খারাপ । আলবার্টকে বলে দিয়েছি ওর খাবারটা যেন ঘরে পৌঁছে দেয় ।
– ওকে একটু যত্ন করো । খুব ভালো ছেলে । কাল ওদের বাড়ির ঠিকানায় কিছু টাকা পাঠিয়ে দিও । ওর মায়ের চিকিৎসার যেন কোনো অসুবিধা না হয় ।
– আচ্ছা দেবো । এখন ঘুমাও তুমি ।
ঘুমিয়ে পড়লেন সোলায়মান । হাজার সমস্যা মুহূর্তে বাষ্পীভূত হয়ে গেলো । শিরিন বিছানা ছেড়ে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়ালেন । মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা গুমোটভাব অনুভব করছেন তিনি । কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে, কেউ তাকে পরিষ্কার করে কিছু বলছে না । তিনি নিজেও সাহস করে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারছেন না, হয়তো অবাঞ্ছিত কোনো তথ্য জেনে যাবেন । কি দরকার অনর্থক দুশ্চিন্তা করার । কিন্তু অধিকাংশ সময়েই মন যুক্তি মানে না । এখনও মানলো না । তিনি নানান ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন । অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলো না ।

ট্রেতে খাবার নিয়ে ভেতরে ঢুকলো আলবার্ট ।
– দাদাভাই, খেয়ে নিন ।
সজল ভীষণ অবাক হয়ে গেলো । –এসব কি আলবার্ট?
– আপনি সবার সাথে খেলেন না, তাই বেগম সাহেবা আপনার ঘরেই খাবার দিতে বললেন । ওদিকের ঝামেলা মিটিয়ে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল । নিন শুরু করুন ।
আলবার্ট টেবিলের উপর ট্রে নামিয়ে রাখলো । সজল উদাস কণ্ঠে বললো– ওসব নিয়ে যাও আলবার্ট । আমার ক্ষিদে নেই ।
– মিথ্যে বলবেন না, দাদাভাই । খেয়ে নিন । খামাখা মন খারাপ করে তো কোনো লাভ নেই । যাকে পাবার নয় তার কথা ভাবাই বা কেন?

বেশ জাঁকিয়ে বিছানায় বসলো সে। সজল চমকে উঠলো।
– কি বলতে চাও তুমি?
নি:শব্দে হাসলো আলবার্ট। একটু ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বললো– কসম কেটে বলুন তো মাইরি, আমাদের আপাজানের কথা ভাবছিলেন কি না?
হতভম্ব হয়ে গেল সজল। এই লোকের বুদ্ধির ধার আছে। – কথাটা ঠিক নয় আলবার্ট। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।
– মিছে বলবেন না ভাইজান। বেশ আয়েশ করে ভুঁড়িতে হাত বুলালো সে। – অবশ্য এতে আপনার কোনো দোষ নেই। এ রকম খাসা চিজ দুনিয়াতে কটা আছে বলুন দেখি। আপনি যুবক মানুষ, আপনার দিলে তো আগুন ধরবেই।
– থামবে তুমি? ভাগো এখান থেকে।
– আরে দাদাভাই, ভাগবো তো বটেই। আপনার এখানে সারারাত বসে থাকলে তো আমার চলবে না। তবে কিনা যাবার আগে আপাজানের কিচ্ছাটা একটু শুনিয়ে দিয়ে যাই।
পানের ডিববা থেকে এক খিলি পান বের করে মুখে পুরলো আলবার্ট, তার চোখেমুখে চাপা আনন্দের ঝিলিক।
– বুঝলেন কিনা, গত দশ বছর ধরে এই বাড়িতেই আছি। অনেক কিছুই জানি। চোখমুখ বুজে এমন জড়র মতো পড়ে থাকি যে, সবাই ভাবে এ ব্যাটা কাটা-বয়রা। খ্যাক্‌খ্যাক্‌ করে হাসলো আলবার্ট। –এই আপাজানের কথাই ধরেন, মাত্র পনের বছর বয়সে পেট নামিয়ে ফেললো। তাই নিয়ে কত কা-।
ছেলেটার সাথে খুব দহরম মহরম ছিলো, সুযোগ পেয়ে বেটাছেলে... হেঃ হেঃ তো আমাদের সাহেব, বেগম সাহেব খুব চেষ্টা করেছিলেন বিয়েটা সেরে ফেলতে। কিন্তু সে ছেলেও বিরাট বড়লোকের একমাত্র পুত্রধন। জন্মের ঘোড়েল। একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। হারামিটা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। এখন তো মহা হুলস্থুল কা-। শেষে বাচ্চা নিকেশ করে তবে রক্ষে।
সজল এসবের কিছুই জানতো না। না জানাই বোধ হয় ভালো ছিলো। তার মনটা অকারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো।
একটা বুদ্ধিমতি মেয়ে এমন বিশ্রী ভুল করে কিভাবে?
আলবার্ট উপচানো কৌতূহল নিয়ে খোঁচা দিলো– খুব দুঃখ পেয়েছেন মনে হচ্ছে দাদাভাই।
– তুমি চলে যাও আলবার্ট। সজলের কণ্ঠে রুক্ষতা ঝরে পড়লো।
অন্য সময় হলে আলবার্ট নিশ্চয় বিড়বিড় করে গাল কষতো, কিন্তু এখন এই মিষ্টি আমেজটা নষ্ট করতে ইচ্ছে হলো না তার। বহুদিন পর কেচ্ছাটা আনকোরা একজনকে শোনাতে পেরে তার খুবই ভালো লাগছে। সে মেঝের উপর একদলা ফিচকে লাল পিক ফেলে হেলেদুলে বেরিয়ে গেলো।
সজল খেলো না। দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই কতো রকম দুঃখ থাকে। বাহিরে দেখে যার অনেক কিছুই ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায় না। এতক্ষণ সে নিজের চরম দারিদ্র এবং অসহায়ত্ব নিয়ে চিন্তা করে কোনো কূল কিনারা পাচ্ছিলো না। কিন্তু এই মুহূর্তে দুঃখবোধের সার্বজনীনতা তার মনকে অনেকখানি হালকা করে দিয়েছে। সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে, তাতে হতাশার চেয়ে স্বস্তির চিহ্নই প্রকট হয়ে ফুটে উঠলো।

পনের

পড়ন্ত বিকেল। নিঃসঙ্গ হাঁটছিলো সজল। বাড়ির আবহাওয়াটা খুবই উত্তেজনাকর। আজ সকালে সোলায়মান চাচার সাথে স্বপ্নিল ভাইয়ার খুব ঝগড়া হয়ে গেছে। লিমা ভাবী সারাটা দুপুর কান্নাকাটি করেছে। চঞ্চল বাসা ছেড়ে চলে গেছে। বলে গেছে ফিরবে না। বিশ্রী এক অবস্থা। দুপুরে সজল খায়নি, কেউ ডাকতেও আসেনি। তেমন মানসিক অবস্থা কারো নেই। সজলের কষ্ট হচ্ছে। একটা সুন্দর সংসার কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।
ঠিক তার পাশে এসে ব্রেক কষলো ঝক্‌ঝকে টয়োটা করোলা। দরজা খুলে গেলো। –আসুন।
নীরবে ভেতরে ঢুকলো সজল। স্টিয়ারিংয়ে বসে আছে নেলী। বিকেলের রক্তাভ আলোয় অপূর্ব দেখাচ্ছে তাকে। বাতাসে উড়ছে ভ্রমর কালো চুল। চোখ ফেরাতে পারলো না সজল। এক্সেলেটরে চাপ দিলো নেলী, সাবলীল গতিতে এগিয়ে চললো গাড়ি।
সজল বললো – আজ ভোরে হাঁটতে গেলেন না যে?
– আজ ঘুম থেকে উঠেই দেখি মেজাজ খারাপ। হাঁটাহাঁটি করতে ইচ্ছে হলো না। আপনি অপেক্ষা করছিলেন নাকি?
– না। আমার ঘুমই ভাঙেনি।
নেলী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে– প্রায়ই দেখি আপনি একাকী হাঁটেন, অনেক দূর চলে যান। কয়েক দিন আমি আপনার পাশ দিয়ে খুব আস্তে গাড়ি চালিয়ে গেছি, আপনি লক্ষ্যও করেন নি। কি এতো ভাবেন বলুন তো?
– আবোল-তাবোল চিন্তা ভাবনা করি। সেসবের কোনো দাম নেই। নেলীর মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না সজল। মেয়েটাকে এতো রহস্যময়ী মনে হচ্ছে!
ব্যাপারটা টের পেলো নেলী। সামান্য অপ্রস্তুত বোধ করলো সে। – আমাকে বুঝি খুব সুন্দর দেখাচ্ছে?
এমন অদ্ভুত প্রশ্নের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলো না সজল। ঝট করে চোখ সরিয়ে নিলো। মৃদু হেসে উঠলো নেলী।
– কি হলো উত্তর দিচ্ছেন না যে?
লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো সজল। – আমাকে মাফ করবেন। আমি ঠিক ইচ্ছে করে কাজটা করিনি।
– ইচ্ছে করে করলেও বা কি? আমার মোটেও খারাপ লাগছিলো না।
সজল বিস্মিত হলো। এই মেয়েটার ব্যবহারে কোথায় যেন বিশাল একটা পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করেছে। পরিবর্তনটুকু সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে।
নেলী অনুযোগ করলো –চুপ করে বসে আছেন কেন? কিছু বলুন।
– আমরা কোথায় যাচ্ছি?
– তেমন কোথাও না। বিকাল বেলাটা আমি গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াই, আজও তেমনি বেড়াবো। কেন, আপনার কি খারাপ লাগছে?
– না, না।
–খারাপ লাগলে আপনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন, আমার কোনো অসুবিধা নেই।
নেলী হেসে উঠলো। সজলের পক্ষেও গম্ভীর হয়ে থাকা সম্ভব হলো না। সে হাসতে হাসতে বললো –আপনি মানুষকে খুব লজ্জায় ফেলতে পারেন।
– ঠিক বলেছেন, এই কাজে আমি খুব তৃপ্তি পাই।
আসাদ গেটে গাড়ি ঘুরিয়ে সংসদ ভবনের রাস্তা ধরলো নেলী।

– সজল, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?
– করুন।
– আপনি কি দুঃখী মানুষ?
– জ্বি না। আমি দুঃখীও নই সুখীও নই। বলতে পারেন নিরামিষ।
– আপনাকে দেখে কিন্তু আমার খুব সুখী মানুষ মনে হয়।
– কেন?
– কারণ আপনার মধ্যে সুখী হবার কোনো চেষ্টা নেই। দুঃখটাকে জড়িয়ে ধরেই বেশ নির্লিপ্তভাবে পড়ে থাকতে পারেন।
গাড়ি ঘোরালো নেলী, ফিরতি পথ ধরলো। সূর্য ডুবে গেছে। আকাশের নীলিমা মুছে গিয়ে সেখানে ধূসর, বেগুনী রঙের খেলা চলছে। মসৃণ বেগ, দুরন্ত উন্মাদনায় ধেয়ে চলা শীতল বাতাস এবং অপরূপ প্রকৃতি সজলকে হঠাৎ অত্যন্ত সাহসী করে তুললো, পাশে বসে থাকা নেলীকে আর আগের মতো খুব দূরের কেউ মনে হয় না।
– আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো?
– করুন।
– আপনি কি সুখী নন?
এই প্রথম ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো নেলী। সজলকে মনোযোগ দিয়ে দেখলো।
– না। তবে আমি সুখী হবার চেষ্টা করছি।
– পারছেন?
– জানি না।
– আমি জানি। পারছেন না। এই ভাবে পালিয়ে বেড়ালে কোনো দিনই পারবেন না।
– আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।
– দেখুন, দুর্ঘটনা এবং ভুলভ্রান্তি আছে বলেই মানুষের জীবনটা এতো রোমাঞ্চকর। আপনারও উচিৎ, সবকিছু ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করা।
ঝট্ করে ব্রেক করলো নেলী, বিমূঢ় দৃষ্টিতে সজলকে পর্যবেক্ষণ করলো। – আপনি এসব কি বলছেন?
হঠাৎ সজল বুঝলো, সীমানা পেরিয়ে গেছে সে। মৃদুস্বরে বললো –আমাকে মাফ করবেন। আমি আপনাকে ব্যথা দিতে চাইনি।
নেলী দৃষ্টি সরালো না। নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো – আপনি সব শুনেছেন, তাই না?
– জ্বি।
– কে বললো?
উত্তর দিলো না সজল। আলবার্টকে বিপদে ফেলে কি লাভ?
খুব ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো নেলী। চাপাস্বরে বললো– ঠিক আছে। না বললেন তার নাম। এই কেচ্ছা শোনানোর মানুষ ঢাকা শহরে খুব কম নেই। হ্যাঁ ভুল একটা করেছিলাম। প্রেমে অন্ধ হয়ে একটা শয়তানের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছিলাম। সর্বনাশ করে পালালো। এর প্রতিশোধ আমি নেবো। যতদিন অপেক্ষা করতে হয় করবো।
জানালার বাইরে সার্জেন্টের মুখ দেখা গেলো।
– কি ব্যাপার রাস্তার মাঝখানে গাড়ি রেখেছেন কেন? এটা কি পার্কিং এরিয়া?
সজল ঝটপট উত্তর দিলো –ওর শরীরটা হঠাৎ... বুঝতেই পারছেন।
– লাইটটা জ্বালুন।
লাইট জ্বেলে দিলো নেলী। তাকে মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষা করলো সার্জেন্ট।

–আপনাকে দেখে তো সত্যিই অসুস্থ মনে হচ্ছে। গাড়ি চালিয়ে ফিরতে পারবেন?
নেলী স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো– পারবো।
– তাহলে গাড়ি সামনে বাড়ান। গাড়ি চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে। যদি বেশি আনইজি ফিল করেন তাহলে রাস্তার সাইডে চলে যান।
নেলী নিজেকে সামলে নিয়েছে। বাড়ির পথেই গাড়ি ছোটালো সে।
সজল কোমল গলায় বললো –নিজের অজান্তে আমি আপনাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করবেন।
– বারবার ক্ষমা চাইবার কোনো দরকার নেই। আপনার উপর আমি রাগ করিনি।
বেশ কিছুক্ষণের নিঃশব্দতা। সামান্য শব্দ করে হেসে উঠল নেলী। সজল সেই আচমকা হাসির কোনো কারণ খুঁজে পেলো না।
– কেন হাসলাম জানতে ইচ্ছে করছে? নেলী নিজেই বললো।
– একটু কৌতূহল হচ্ছে।
– আপনার কাছে এতদিন আমি ছিলাম দূর কোনো গ্রহের অচিন অপ্সরীর মতো, যাকে দেখা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না। অথচ এখন থেকে আমি আপনার কাছে আরো দু-দশটা সাধারণ মেয়ের মতোই একজন হয়ে গেলাম। তাই না?
– আপনার কথাটা ঠিক নয়। আপনি কোনো সাধারণ মেয়ে নন। আপনার সাথে প্রথম আলাপেই যে কেউ সেটা বুঝতে পারবে।
– কিন্তু আমার যে খুব সাধারণ হতে ইচ্ছে করে। আবার হেসে উঠলো নেলী।
সজল ধাঁধায় পড়ে যায়। মেয়েটার হাসির কোনো কূল কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না।
– আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?
– বলুন?
– এই প্রতিহিংসার কথাটা ভুলে যান। ধরে নিন ওটা একটা দুঃস্বপ্ন। এখন আপনার ঘুম ভেঙ্গেছে। আপনি স্বাভাবিক জীবন যাত্রা শুরু করুন। আপনার বয়সী অন্য মেয়েরা যেভাবে চলছে, ভাবছে, স্বপ্ন দেখছে, আপনিও সেভাবে সব কিছু করুন। দেখবেন, আপনার সমস্ত ক্ষোভ নষ্ট হয়ে যাবে। শক্তি পাবেন।
বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বললো না নেলী। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। –সজল, আপনাকে দেখলে মনে হয় না আপনি এতো কিছু বোঝেন। যাই হোক, আমি চেষ্টা করে দেখবো। সবাই আমাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করবে না জানি, তবুও চেষ্টা করবো।
বাকী পথে আর কোনো কথা হলো না। তবে নেলী হঠাৎ হঠাৎ মৃদু শব্দে হেসেছে। সজল কৌতূহলী হয়ে তাকিয়েছে, কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি। নেলীর এই অদ্ভূত হাসির কারণ তার জানা হলো না।

ষোল

মাঝরাতে ঘুম ভাঙতে নেলীর অনুভূতি খুব সুখকর হলো না। এমন একটা স্বপ্নের জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিলো না। অনাহুত স্বপ্ন।
নেলী দেখছে, স্বচ্ছ নীল পানিতে ডুবে গেছে সে, তার চারপাশে নাম না জানা অজস্র মাছের সমাবেশ, তারা তাকে ঘিরে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। হঠাৎ সমস্ত গতি থেমে যায় এবং অজস্র মাছ একটি মাত্র বিশাল মাছের রূপ নেয়, মাছটির চোখ, মুখ, হাসি সব কিছুই এতো পরিচিত মনে হয়! হঠাৎ সে আবিষ্কার করে সজলকে। তার ঘুম ভেঙে যায়।
গভীর অন্ধকারে আত্মমগ্ন হয়ে হৃদয়ের প্রতিটি কুঠরিতে অন্ধের মতো হাতড়াতে থাকে নেলী, সত্যিই কি এমন কোনো দুর্বলতা তাকে গ্রাস করেছে? নির্দিষ্ট কোনো উত্তর খুঁজে পায় না সে। মানুষটাকে তার ভালো লাগে। কিন্তু কেমন ভালো তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। দূর থেকে দেখে নদীর ওপারের দৃশ্যটির প্রতি মানুষের যেমন মমতা জন্মায়। এই মৃদু অনুরাগে যেন সেই সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। একে মোহ বলা যায় না, ভালোবাসাও বলা যায় না।
বোকার মতো হাসতে থাকে নেলী। তার কি হয়েছে? কি চায় সে? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করে না। জিজ্ঞাসার রেশটুকু শুধুমাত্র অনুরণিত হয় মস্তিষ্কের কোষে কোষে। তবে এইটুকু সে স্পষ্ট বোঝে, সজলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা তার শোভা পায় না। দীর্ঘকালের গ-ীতে বাঁধা পড়ে গেছে একটি সোপান, পাশাপাশি, তবুও যেন দূর কোনো নক্ষত্র। আরোহণে যন্ত্রণা, অবরোহণে আরো যন্ত্রণা।
পুনরায় ঘুমিয়ে পড়তে সাহস হয় না নেলীর। তার ভয় হয়। সেই অজস্র মাছের ঝাঁক আবার হয়তো একটি বিশাল মাছের আকার নেবে এবং মাছটির মুখ হবে সজলের। এক অজানা আশংকায় সে বারবার কেঁপে ওঠে। তাকে বাকি রাতটুকু জেগেই কাটাতে হয়।

সতের

থানায় পৌঁছাতে স্বপ্নিলের কিছুটা দেরি হয়ে গেল। সকালে উঠেই লিমার সাথে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে হয়েছে। আজ সারাদিন শ্রীমতির মুখ দর্শন করার কোনো রকম সম্ভাবনা নেই। মনটা বিষিয়ে আছে তার। তৌফিককে অমাবস্যার মতো মুখ করে বসে থাকতে দেখে পিত্তি জ্বলে উঠলো।
– কি ব্যাপার তৌফিক, বিয়ে-টিয়ে করছো নাকি? বিয়ে করার আগে আমারও মুখের দশা এই রকম হয়েছিলো। হাঃ হাঃ হাঃ ...।
তৌফিক হাসিতে যোগ দিলো না। ভাঙা স্বরে বললো– খুব খারাপ খবর আছে স্বপ্নিল।
ঝটপট বলে ফেলো। দুনিয়ায় এখন খবর মাত্রই খারাপ।
– কেসটা উইথড্রন হয়ে গেছে।

– কি?
– লতিফ হত্যা কেসের তদন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। তার পরিবার থেকে কেস তুলে নেয়া হয়েছে।
– বললেই হলো? এটা ইয়ার্কি নাকি? খেঁকিয়ে উঠলো স্বপ্নিল।
গাঢ় নিশ্বাস ছাড়লো তৌফিক। –এখন চেঁচিয়ে কোনো লাভ হবে না। ওপর থেকে হুকুম এসেছে, কোনো রকম তদন্ত করবার দরকার নেই। তাছাড়া কেসও তুলে নেয়া হয়েছে। সুতরাং কিছু করার নেই আমাদের। শুনলাম তোমাদের কারখানাও দু-একদিনের মধ্যে চালু হতে যাচ্ছে। খুব খারাপ লাগলো স্বপ্নিল। এইসব ব্যাপার এতোকাল শুধু শুনেই এসেছি, এই প্রথম চোখে দেখলাম।
রাগে থরথর করে কাঁপছে স্বপ্নিল। তৌফিককে কিছু না বলেই ঝড়ের বেগে থানা থেকে বেরিয়ে এলো সে। এক্ষুনিই শ্রমিক পাড়ায় যাওয়া দরকার । এসব কি হচ্ছে? লতিফের বউ কেস তুলে নেবার সাহস পায় কোথায়? জুতো দিয়ে পিটিয়ে বেটির পিঠের চামড়া তুলে ফেলতে হবে। স্কুটার নিলো সে।
–চালাও।
– কোথায় যাবেন স্যার?
– চোপ শালা। সোজা নাক বরাবর চালা।
ড্রাইভার লোকটা আড়চোখে ওকে একবার দেখলো। মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হলো সে। দিনে-দুপুরে মাতলামী করার কোনো মানে হয় না। বিরস মুখে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলো। দুনিয়া বদলে যাচ্ছে। এখন আর দিনরাতের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। সে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে নাক বরাবর স্কুটার ছোটালো।

আঠার

সকাল থেকেই শরীর ভালো লাগছিলো না লিমার, অদ্ভুত এক ধরনের অস্বস্তিকর অবস্থা। মাথাটা সামান্য ঝিমঝিম করছে। তলপেটে চিনচিনে একটি অনুভূতি। দুপুরের দিকে দুবার বমি করলো সে। লক্ষণ বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না শিরিনের। তবুও ডাক্তারকে খবর দেওয়া হলো। বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর ভদ্রলোক হাসিমুখে রায় দিলেন– আপনি মা হতে চলেছেন মিসেস লিমা।
ডাক্তারের সামনেই শিরিনকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো লিমা।
শিরিন হাসলেন। –এই বোকা মেয়ে, এমন একটা আনন্দের খবর শুনে কাঁদতে আছে নাকি!
লিমার কান্নার বেগ বাড়লো। শিরিনকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরলো সে। বোঝা গেলো এই পর্বত প্রমাণ আনন্দের বোঝা নিয়ে কি করবে সে, বুঝতে পারছে না। শিরিন গভীর স্নেহে তার মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।
এতো বড় একটা সুসংবাদ নিয়ে কি করা যায় সিদ্ধান্ত নিতে নেলীরও যথেষ্ট বিলম্ব হলো। বাসায় ভাইয়ারা কেউ নেই, বাবা অফিসে, সুতরাং ফোন করে শিলাকেই খবরটা জানালো সে। শিলা হৈচৈ করে উঠলো।
– বলো কি! উহ্ কি দারুণ! আচ্ছা, কি হবে বল তো? ছেলে না মেয়ে?
– তা কি করে বলবো?
– একটা কিছু ধারণা করো না?
– হবে কিছু একটা।
– আচ্ছা, কি হলে তুমি খুশি হও তাই বল?

– একটা বাঁদর হলে খুব খুশী হবো। ধ্যাৎ, শিলা'পা, এতো বকবক না করে জলদি চলে এসো তো। ভাবীকে কাঁধে নিয়ে নাচতে ইচ্ছে করছে আমার। কিন্তু কাজটা একাকী করা যাবে না। তোমাকেও দরকার।
খিলখিল করে হেসে উঠলো শিলা। – এক্ষুনি আসছি আমি।
সমস্ত দুপুর ধরে অনাগত শিশুটিকে নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা চললো। লিমার ধারণা, ছেলে হবে। নেলী চোখমুখ বিকৃত করলো। – ঐ ঘোড়ার ডিম হওয়ার চেয়ে কিছু না হওয়াও ভালো।
– হ্যাঁ, তুমি যে কি নেলী। কবে কি একটু হয়েছে তাই মনে রেখে ঐ দুধের ছেলেটার উপরে রাগ ঝাড়ছো।
– ইস্ পরের ছেলের উপর তো খুব দরদ। নিজের একটা ব্যবস্থা করতে পারছো না?
– আমার কি দোষ? তোমার ভাইটাই তো বাগড়া দিচ্ছে।
লিমা হেসে বললো– দেখতে হবে তো কার ভাই।
চোখ পাকালো নেলী– তুমি অমন দাঁত কেলিয়ে হেসো না। যে পাগলের ঘর করছো, একটা রেডিমেড পাগল জন্ম নিলেও অবাক হবার কিছু নেই।
অন্যদিন হলে নির্ঘাৎ রেগে যেতো লিমা। কিন্তু আজ হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেলো তার।
বেলা দুটার দিকে বাসায় ফিরলো চঞ্চল। চোখমুখ শুকনো, কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ। প্রথমেই শিরিনের সামনে পড়লো সে। উদ্বিগ্ন চোখে ওকে লক্ষ্য করলেন শিরিন।
– কি হয়েছে রে চঞ্চল? অমন মনমরা হয়ে আছিস কেন?
– কিছু না মা।
– তোর ভাবির বাচ্চা হবে। আজিজ ডাক্তার বলে গেলো।
দু'চোখ বিস্ফারিত হলো চঞ্চলের। – বলো কি!
– ঠিকই শুনেছিস, বাবা। যা, লিমা উপরে আছে। শিলাও এসেছে।
একদৌড়ে উপরে উঠে এলো চঞ্চল। লিমাকে জড়িয়ে ধরেই দু'গালে চুমো খেলো। – লক্ষ্মী ভাবী, একটা ভাইঝি চাই। ফুটফুটে, নাদুসনুদুস। কথাটা খেয়াল থাকে যেন।
লজ্জায় মুখ ঢাকলো। – ধ্যাৎ।
শিলা চোখ পাকালো। – ফালতু কথা বলবে না। এতক্ষণ ঝগড়া করে করে আমরা ছেলের জন্য নেলীকে প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছি। এখন বিগড়ে দিও না।
নেলী হাসতে হাসতে বললো– না ভাইয়া আমি তোর দলে।
শিলা উসকালো– এই নেলী, বারবার মত পালটানো চলবে না।
শিরিন বাইরে থেকে ডাকলেন– চঞ্চল শোন্।
চঞ্চল বেরিয়ে আসতেই একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন তিনি। তার মুখে স্পষ্ট দুশ্চিন্তার চিহ্ন।
– সত্যি করে বল্ বাবা, খারাপ কিছু হয়েছে কি না? তুই তো অকারণে অমন গোমড়া মুখে বাসায় ঢুকিস না। তাছাড়া তোর বাবাকেও অফিসে ফোন করে পেলাম না। কি হয়েছে বল্?
মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে পড়লো চঞ্চল। – খুব বিশ্রী একটা ব্যাপার হয়েছে, মা। ভাইয়া কয়েকজন শ্রমিককে নিয়ে কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলো। পুলিশ সব কজনকে ধরে নিয়ে গেছে।
রক্ত সরে গেলো শিরিনের মুখ থেকে।
– স্বপ্নিল...?
– হ্যাঁ থানায়। আমি বাবার সাথে গিয়েছিলাম। বাবা বললেন, থাক দু-একদিন।
শিরিন কেঁদে ফেললেন। – তা তো উনি বলবেনই। ওনার কি মায়া-মহব্বত আছে? পাগল ছেলে, ভেবেচিন্তে কখনো কিছু করে না। ওর উপর রাগ করে কোনো লাভ আছে?

মায়ের কাঁধে হাত রাখলো চঞ্চল। – কেঁদো না মা। বাবাকে যতোটা নিষ্ঠুর মনে হয়, বাবা তা নয়। ভাইয়া আজকেই ফিরে আসবে।
আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন শিরিন। – তোদের কাউকেই আমি বুঝি না। একেকজন একেক রকম। তুই লিমাকে এখন এসব কিছু বলতে যাস না। বেচারীর মন খারাপ হয়ে যাবে। আর পারিস তো সজলকে খবরটা দিয়ে আয়।
– আমি এখনই যাচ্ছি, মা।
শিরিন চলে যেতেই শিলা এসে হাত চেপে ধরলো। – এই চঞ্চল কি হয়েছে? চাচি আম্মাকে এতো গম্ভীর দেখলাম কেনো?
– তুমি এই বাড়ির বউ হয়ে আসবা শুনে খুব রাগারাগি করলো মা। বললো আর মেয়ে পেলি না। শেষে ঐ ঢ্যাঙাটাকে এনে ঘরে তুলবি? তোর কি একটা কলসি আর এক টুকরো দড়ি জোটে না!
ওর পিঠে একটা কিল বসালো শিলা।
– ফাজলামি করো না। কি হয়েছে বলো।
– বলবো না। তোমার শাড়ির পুরুত্ব অত্যন্ত অল্প। চারদিকে বলে বেড়াবে।
– কেন, খারাপ কিছু?
– তাও বলা যাবে না। তুমি লিমার পাশে গিয়ে বসো। আমি একটু ঘুরে আসি।
– কোথায় যাবে?
– বলা যাবে না। চঞ্চল দ্রুতপায়ে নিচে নেমে গেলো। শিলা ভ্রু কুঁচকালো। নতুন করে আবার কি ঘটলো?
লিমা ভেতর থেকে ডাকলো – এই শিলা, নেলী কি বলছে শুনছো?
– কি?
– আমার প্রথমটা নাকি ছেলে হবে, আর তোমারটা মেয়ে হবে। বেশ হয় কিন্তু দুটোর বিয়ে দিয়ে ঘরের ছেলেমেয়ে ঘরেই রেখে দেবো।
শিলা চোখ পাকালো। –কক্ষনো না। মেয়ে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।
খবরটা শেষ পর্যন্ত চেপে রাখা গেলো না। বিকালের দিকে লিমার কানে গেলো। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেললো সে। বাসার আনন্দঘন পরিবেশ সামান্য সময়ের ব্যবধানে শোকতপ্ত হয়ে পড়লো।
সজল দুপুরে বাসায় ছিলো না। বিকালে ফিরতেই আলবার্ট তাকে প্রথম খবরটা দিলো।
–শুনছেন না কি দাদাভাই? আমাদের পাগলা সাহেব জেলে। সাহেবের কারখানায় আগুন ধরাতে গিয়ে এই কেলেঙ্কারী। একেই বলে ন্যাংটা পাগল। হাঃ হাঃ–
দ্বিতীয় খবরটা তাকে দিলো নেলী। সজলের মিশ্র অনুভূতি হলো।
– ভাবী কি স্বপ্নিল ভাইয়ের খবর জানেন?
– হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে শুনেছেন। ভীষণ কাঁদছেন।
– আমি একবার থানায় যাবো?
– আপনি থানায় গিয়ে কি করবেন? বাসায় থাকুন। এগুলো পারিবারিক সমস্যা। এসবে আপনার জড়িয়ে যাবার কোনো দরকার নেই।
সজলের খুব ইচ্ছে করছিলো থানায় গিয়ে স্বপ্নিলের সাথে একবার দেখা করে। কিন্তু নেলীর অবাধ্য হতে তার সাহস হলো না। সে নিজের ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকলো।

উনিশ

সোলায়মান ফিরলেন সন্ধ্যায় । স্বপ্নিল এবং চঞ্চলও তার সাথে ফিরেছে । তিনি গম্ভীরমুখে শিরিনকে বললেন –ইচ্ছে ছিলো না তবুও ওটাকে নিয়ে এলাম । এতো বড় একটা সুসংবাদ । বৌমা কোথায়?
– খবরটা শোনা পর্যন্ত কাঁদছে । স্বপ্নিল, তুই ওর কাছে যা ।
স্বপ্নিলকে অনেক ধীর স্থির দেখাচ্ছে । তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে না আজ এতো কিছু ঘটে গেছে । স্বাভাবিক পায়ে উপরে উঠে গেলো সে । লিমা তাকে জড়িয়ে ধরে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলো । – কেন তুমি এই ধরনের পাগলামী করো? আমার জন্যেও কি তোমার এতোটুকু ভালোবাসা নেই?
স্বপ্নিল বিরক্ত মুখে বললো– কি ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে কান্নাকাটি শুরু করলে? থামো তো ।
– না থামবো না । তুমি আগে কথা দাও এই ধরনের কাজ আর কখনো করবে না ।
– এই ধরনের কাজ করবার আর দরকারও পড়বে না । কালই আমরা এই বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছি । আজই যেতাম কিন্তু তোমার জন্যেই সম্ভব হচ্ছে না । রাস্তা-ঘাটে মেয়েমানুষ নিয়ে রাত কাটানো সহজ ব্যাপার না ।
নেলী তীক্ষ্ণস্বরে বললো– এসব তুই কি বলছিস বড় ভাইয়া? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি এক্ষুনি মাকে আনছি ।
– ডাক না । আমি কাউকে ভয় পাই নাকি? কাল সকালেই আমি আমার বউ নিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো । কেউ কান্নাকাটি করলেও শুনবো না ।
– তোর জন্য আবার কাঁদবে কে? তোর যেখানে ইচ্ছে তুই চলে যা । কিন্তু ভাবী তোর সাথে যাবে না ।
– আমার বউ আমার সাথেই যাবে । লিমা জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও । কাল সকাল সকাল উঠেই রওনা দেবো ।
নেলী শিরিনকে খবর দিতে ছুটলো । শিরিন সঙ্গে সঙ্গে উপরে দৌড়ে এলেন । –স্বপ্ন, এসব কি শুনছি?
– ঠিক শুনেছো মা । আমি কোনো খুনীর সাথে একবাসায় থাকতে পারবো না ।
শিরিন তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন ।
– নিজের বাবা সম্বন্ধে এমন একটা কথা বলতে তোর মুখে বাঁধে না?
– সত্যি কথা বলতে মুখে বাঁধবে কেন?
– সত্যি কি মিথ্যে তুই জানছিস কেমন করে? তুই কি অন্তর্যামী?
– অতো কথা আমার শোনার দরকার নেই । আমি কাল অতি প্রত্যুষে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি । সাথে লিমাও যাচ্ছে । এই বাড়িতে আর নয় ।
– খবরদার স্বপ্ন, লিমাকে নিয়ে তুই কোথাও যেতে পারবি না ।
স্বপ্নিল গম্ভীর কণ্ঠে বললো –ঠিক আছে । লিমা যদি থাকতে চায় তাহলে থাকবে । আমি একাই যাবো ।
নেলী বললো– ভাবি, তুমি কোথাও যাবে না । ওর ইচ্ছে হলে ও যাক ।

লিমা মুখে আঁচল চেপে কাঁদতে লাগলো। স্বপ্নিলের মাথায় এমন ধারণাটা একবার যখন এসেছে তখন বাড়ি ছেড়ে সে যাবেই। লিমার এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কি করবে? ঐ পাগল মানুষটার হাত ধরে বেরিয়ে যাবে? এই অবস্থায় এতোখানি ঝুঁকি নেয়া কি ঠিক? লিমা কিছুই ভাবতে পারে না।

কুড়ি

সজল বারান্দায় একাকী দাঁড়িয়ে ছিলো। স্বপ্নিলের সিদ্ধান্তের কথা সে শুনেছে। কিছুক্ষণ আগেই স্বপ্নিলের সাথে নেলী এবং শিরিনের বিশ্রী একটা ঝগড়া হয়ে গেছে। সজল বুঝতে পারছে, এই বাসায় ভাঙনের বীজ ঢুকে গেছে।
পায়ের শব্দ শুনেই সে বুঝলো, স্বপ্নিল আসছে। স্বপ্নিল তার কাঁধে মৃদুভাবে চাপড় দিলো।
– শুনেছো তো, আমি কাল সকালেই বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। লিমা অবশ্য থাকছে। পেটে বাচ্চা তো। ভেবেচিন্তে দেখলাম এই অবস্থায় ওকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করাটা ঠিক না। কোথায় থাকি না থাকি তার তো ঠিক নেই।
– সত্যিই যাবেন, স্বপ্নিল ভাই?
– দেখো সজল, আমি এককথার মানুষ। যা বলবো তা করবই। যাই হোক, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি। তুমিও এই বাসায় আর থেকো না। এটা হচ্ছে খুনির বাসা। এই বাসায় তোমার-আমার মতো ভালোমানুষেরা থাকতে পারে না। আমি তোমাকে একটা ঠিকানা দিচ্ছি তুমি সেখানে চলে যাও। বাবা তোমাকে চাকরি ফাকরি কিছু দেবে না। দিলেও বা তুমি নেবে কেন? তুমি একটা পুরুষ মানুষ না? নিজের চেষ্টায় অনেক কিছু করা যায়। তুমিও একবার চেষ্টা করে দেখো। আমার জন্যেও একই কথা। আমি ঠিক করেছি, বাবার সম্পত্তি আমি নেবো না। নিজেই কিছু একটা করবো।
সজল কিছু বলছে না দেখে তাকে সজোরে ঝাঁকি দিলো স্বপ্নিল।
– কি হলো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?
– জ্বি না। আপনার কথা শুনছি।
– শুধু শুনলে তো চলবে না। সেই মতো কাজও করতে হবে। এই কাগজটা রাখো। এতে একটা ঠিকানা লেখা আছে। ওখানে সানোয়ার নামে একটা পাগল থাকে। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।
সজল কাগজটা নিলো। – জ্বি, আচ্ছা।
– যাচ্ছো তাহলে?
– ভেবে দেখি।
– অতো ভাবাভাবির কিছু নেই। তুমি আর আমি হচ্ছি একই ধরনের মানুষ। আমি যেখানে থাকতে পারছি না সেখানে তুমি থাকবে কি করে। যতো তাড়াতাড়ি পারো এখান থেকে ভাগো। ঠিক আছে?
– জ্বি।

– গুড । এই নাহলে পুরুষ মানুষ ।
স্বপ্নিল একটা গানের কলি ভাজতে ভাজতে চলো গেলো । সজল কাগজটাতে চোখ বোলালো । এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার মতো মানসিক শক্তি কি তার আছে? তাছাড়া সে যাবেই বা কেন? স্বপ্নিল ভাই অনেক অযৌক্তিক কথাবার্তা বলেন । সোলায়মান চাচাকে সজলের কখনই খারাপ মনে হয়নি ।
খুব শীঘ্রই সজলের চিন্তা অন্য খাতে মোড় নেয় । যে বাড়ির একটা ছেলে সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে সেখানে সে একজন অনাহুত অতিথি হয়ে কি ভাবে থাকে? স্বপ্নিলের চলে যাওয়ার পর এই বাসায় একটা শোকের ছায়া নেমে আসবে, ভাবী রাতদিন কাঁদবেন, শিরিন শুকনো মুখে নামাজের পাটিতে বসে থাকবেন, চঞ্চল রাতে বাড়ি ফিরবে না, হয়তো নেলীও গম্ভীর হয়ে থাকবে । তখন সে একটা নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো নিচের একটা ঘর কুক্ষিগত করে কালাতিপাত করবে ।
সজল দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে । এই পরিবারের সুখময় মুহূর্ত সে দেখেছে । অন্যের সুখ দেখতে ভালো লাগে । নিজেকেও সুখী মানুষ মনে হয় । কিন্তু দুঃখের প্রকোপ সহ্য করা কঠিন । এই পরিবারের শোকতপ্ত রূপ সে দেখতে চায় না । চাকরির তার খুব প্রয়োজন ছিলো । সেটাই সব নয় ।
সজল আবারও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে । তাকে হয়তো সত্যিই চলে যেতে হবে । আর কিছু না হোক, নেলীর জন্যেই তাকে চলে যেতে হবে । গত কয়েক দিন ধরেই সে লক্ষ্য করেছে, নেলীকে দেখলেই তার অনেক ধরনের শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয় । হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় । মুখ ঘামতে শুরু করে । এর অর্থ খুবই পরিষ্কার । নেলীকে ভালোবাসতে শুরু করেছে সে । কি ভয়াবহ ব্যাপার ।
কাগজটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো সজল । এমন আচমকা কত ঘটনাই তো ঘটে । তার জীবনেও নাহয় একটা ঘটলো । পরিণতি নিয়ে সব সময় ভাবা চলে না । পরিস্থিতি মানুষকে দিয়ে অনেক কিছুই করিয়ে নেয় ।

একুশ

সেদিন রাতে সকলের অলক্ষ্যে বাড়ি ছাড়ে সজল । অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আলোয় ঝলমল বিশাল বাড়িটার দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে সে, তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এই বাড়িটাতে গত দেড় মাস সুখে-দুঃখে কেটে গেছে । কারো প্রতিই তার কোনো ক্ষোভ নেই । বরং মাত্র এই কদিনেই সবার প্রতি কেমন যেন একটা ভালোবাসার অনুভূতি জন্মে গেছে । চলে যেতে কষ্ট হচ্ছে ।
সজলের গলা ভারি হয়ে আসে, চোখের কোণ ভিজে ওঠে । এই মানুষগুলোকে যতোটা দূরের মনে হয় এরা আদৌ ততটা দূরের নয় । এদেরও সুখ আছে, দুঃখ আছে, যন্ত্রণা আছে ।
দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় সজল । এভাবে পালিয়ে না গেলেও হতো । কিন্তু ঘটা করে বিদায় নেবার ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত লজ্জাকর মনে হচ্ছিলো । তার থাকা না থাকায় এই পরিবারের কি আসে যায়? এটাই বরং ভালো হয়েছে । সজল একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ।
বাসাবোর অলিতে-গলিতে ঘণ্টাখানেক অবিশ্রাম চক্কর দিয়ে অবশেষে বাসাটা খুঁজে পেলো সজল । মাঝারি আকারের পুরানো বাড়ি । ঝড়বৃষ্টিতে এককালের সাদা প্লাস্টার খসে সিমেন্ট বেরিয়ে এসেছে । লোহার

ভারি গেট । বাইরের বারান্দায় অল্প পাওয়ারের একটা বাল্ব মিটমিটিয়ে জ্বলছে । দরজায় টোকা দিতেই কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ।

– কে?

– আমি সজল । স্বপ্নিল ভাই আমাকে পাঠিয়েছেন ।

দরজা খুলে যায় । ঈষৎ বেঁটে, অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, কুদর্শন হাসিখুশি ছেলেটাকে দেখেই ভালো লেগে যায় সজলের !

– আপনি সানোয়ার ?

– আলবৎ । আসুন, ভেতরে আসুন । স্বপ্নিল ভাই কেমন আছেন ?

– ভালো ।

ভেতরে ঢোকে সজল । মাঝারি আকারের ঘর, গুমোট, চারিদিকে মাকড়সার জালের ছড়াছড়ি, একেবারেই আসবাবপত্রহীন । সানোয়ার বললো –স্বপ্নিল ভাই আপনার কথা আমাকে বলেছিলেন । কিন্তু আপনি যে আমার এখানে চলে আসবেন এটা তো আমি কল্পনাও করিনি ।

– আপনার এখানে হয়তো আমাকে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে । আপনার কোনো অসুবিধা হবে না তো?

সানোয়ার প্রাণ খুলে হেসে উঠলো । - আরে ভাই, আমার কি অসুবিধা । আপনার কোনো অসুবিধা না হলেই হলো । ঘরটার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন । বাড়ির ওদিকে মালিক নিজে থাকেন, অনেক হাতেপায়ে ধরে এই কামরাটা আমি ভাড়া নিয়েছি । বুঝলেন কিনা, চেহারা সুরতের যা দুর্দশা, সবাই ভাবে এই ব্যাটা চান্স পেলেই বাড়ির সবকটা মেয়ের সর্বনাশ করে সটকে পড়বে হাঃ হাঃ..., কেমন বিপদ বুঝুন দেখি একবার ।

সজলও হেসে ফেললো । সানোয়ার জানতে চাইলো –খাওয়া-দাওয়া করেছেন ?

– জ্বি না ।

– বেশ করেছেন । রাত এগারোটার সময় আমি অতিথি আপ্যায়ন করি কি দিয়ে?

– আপনাকে ভাবতে হবে না । আমি হোটেল থেকে খেয়ে আসবো ।

সানোয়ার উচ্চস্বরে হাসতে লাগলো । আপনি দেখছি ঠাট্টাও বোঝেন না! আরে ভাই, আমার এখানে ওসব লজ্জা-ফজ্জা করার কিছু নেই । নিজের বাড়ি মনে করে দিন গুজরান করবেন । যান যান, হাতমুখ ধুয়ে আসুন । গামছা-টামছা না থাকলে আমারটা নিয়ে যান ।

সানোয়ারের রান্না চমৎকার । সজল অভিভূত হয়ে পড়লো ।

– আরে, রান্নার আর দেখেছেন কি ? এক ছুটির দিনে আপনাকে আমার স্পেশাল খিচুড়ি খাইয়ে দেবো, একবার খেলে ইহকালে ভুলবেন না ।

শোবার ব্যবস্থা অতি সাধারণ । মেঝেতে মাদুর পেতে কাঁথা বিছিয়ে দেয়া হলো । ঘরের এক কোণ থেকে একজোড়া ময়লা চটচটে বালিশ বের হলো ।

– এই হলো আমার সোনার শয্যা, চোখেমুখে একরাশ হাসি ছড়িয়ে বললেন সানোয়ার –আপনার কোনো অসুবিধা হবে না তো, দাদা ?

– না, না । গাঁয়ে তো আমরা সবাই এভাবেই শুই ।

– বলেন কি দাদা, আপনি গাঁয়ের ছেলে । এই যে, নাদুস-নুদুস শরীরখানা দেখছেন, শুধুমাত্র এটার মায়াতেই এই দোযখে এসে পচে মরতে হচ্ছে । ভাইগুলো মহা বিটকেল, একবেলা খেতে দেবে তো তিনবেলা পালিশ করবে । কাঁহাতক এই ইতরামী সহ্য হয় । পাছায় লাথ মেরে ভেগে এসেছি । ছোটখাটো একটা চাকরি করি, খাই-দাই, বেশ আছি । তা দাদা, আপনি কোন গাঁয়ের মানুষ?

– আমি দক্ষিণের মানুষ । গাঁয়ের নাম বললে আপনি কি চিনবেন ?

– না চিনি, বলুন তো। বুঝলেন কিনা, যে গাঁয়েরই নাম শুনি মনে হয় এ যেন আমারই গাঁ, কতকাল ছিলাম সেখানে, কত সুখ দুঃখের স্মৃতি লুকিয়ে আছে তার মাঠেঘাটে। বডডো দুষ্টু ছিলাম দাদা ছোটবেলায়। একবার হ্যাঁচকা টানে মৌলভী সাহেবের লুঙ্গি খুলে দিয়েছিলাম হাঃ হাঃ হাঃ – তাই নিয়ে কত কা-। লিখতে বসলে আস্ত একটা মহাভারত হয়ে যাবে। তা দাদা, গাঁয়ের নামখানা ?
– বিদুলিপুর।
– বিদুলিপুর। আহা কি সুন্দর নাম! শুনলেও প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আমার গাঁয়ের নাম জব্বলগনুগঞ্জ। মারহাবা জায়গা। চারদিকে শুধু সৌন্দর্য আর সৌন্দর্য। আপন মনে হেসে উঠলো সানোয়ার –বুঝলেন কিনা দাদা, পনের ষোল বছর বয়সে একটা মেয়ের খুব প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম, পাটক্ষেতে একলা পেয়ে এক্কেবারে সেঁটে ধরলাম। তা বেটির কোনো কা-জ্ঞান নেই, কেঁদে-কেটে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে দিলো। শেষে গুনে গুনে পঁচিশটা জুতোর বাড়ি খেতে হলো, হাঃ হাঃ। আহা, কি জীবন। অথচ দেখুন দাদা, সেইসব ফেলে কোথাকার কোন অস্থানে-কুস্থানে পড়ে আছি। জন্মটাই বৃথা। এই খাবার-দাবারের লোভটুকু না থাকলে এতোদিনে নির্ঘাত গলায় দড়ি দিতাম। দাদা বোধ হয় ভাবছেন কি পাগলের পাল্লাতেই না পড়লেন- হাঃ হাঃ হাঃ পাগলামীর আর দেখেছেন কি ?
বাড়িওয়ালা জায়েদ সাহেব নিজে এসে ধমক লাগিয়ে গেলেন –সানোয়ার, এমন করলে তো তোমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। কটা বাজে খেয়াল আছে? ছেলেমেয়েরা কেউ ঘুমাতে পারছে না। এতো বয়েস হলো অথচ এই সামান্য কা-জ্ঞানটুকু হলো না-।
ভদ্রলোক চলে যেতেই আট হাত জিভ দেখিয়ে ভেঙচালো সানোয়ার। –এহ, খুব উপদেশ দিতে এসেছেন! রাত-দুপুরে যখন বউ পিটিয়ে রাজ্যের মানুষের পি- চটকাও তখন খেয়াল থাকে না ? শালা উড়নচ-ী বেত্তমিজ !
সানোয়ারের বকবকানির অত্যাচারে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারলো না সজল।

বাইশ

স্বপ্নিল সকালে উঠেই তার জামা-কাপড়ের বিশাল এক পুঁটলি বানালো। –আমি চললাম। কেউ যেন আমাকে বাঁধা দেবার কোনো রকম চেষ্টা না করে।
লিমা গত রাতে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কোনো কাজ হয়নি। সে বিকৃত মুখে বললো –বাঁধা দিতে কারো বয়ে গেছে। যাক না যেখানে খুশি।
শিরিন কাঁদতে লাগলেন। –স্বপ্ন, এই পাগলামিটা করিস্ না।
– এটা কোনো পাগলামি নয়। এটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আমাকে বাঁধা দিয়ে কোনো লাভ নেই।
– লিমার কথাটা একবার ভাব্ বাবা। এই অবস্থায় ওকে ফেলে যাচ্ছিস্...
লিমা তীক্ষ্ণস্বরে বললো– আমি ওর কেউ না, মা। যাচ্ছে যাক। শুধু বলে দিন, আমার মুখ যেন আর কখনো দেখতে না আসে।

স্বপ্নিল গম্ভীর কণ্ঠে বললো– মা, ওকে বলে দাও, ওর মুখ না দেখলে আমার কিছুই আসে যায় না। যাই মা, তোমার এই হতভাগা সন্তানের জন্য একটু আশীর্বাদ করো।
লিমার কান্না পাচ্ছে। তার আশা ছিলো শেষ মুহূর্তে হয়তো তার মুখের দিকে চেয়েই স্বপ্নিল যাবে না। সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো– আশীর্বাদ না মা, মুখে ঝাড়ু মারেন।
স্বপ্নিল হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগলো। –আরে, আমার উপর রাগছো কেন? আমি তো তোমাকে সাথে নিতেই চেয়ে ছিলাম, তুমিই তো যেতে চাচ্ছো না।
–হ্যাঁ, ওর সাথে মরতে যাবো।
–তাহলে আর বকবক করছো কেন? এই নেলী যাই রে।
নেলী নির্বিকার কণ্ঠে বললো –আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বেড়াতে এসো ভাইয়া। খুব খুশি হবো।
– সেটা বোধ হয় সম্ভব হবে না। আমি ঠিক করেছি বাবা বেঁচে থাকতে এই বাড়ির ছায়াও মাড়াবো না।
সোলায়মান নিঃশব্দে বিদায় দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি এবার কড়াস্বরে বললেন–শিরিন, ওকে বলে দাও আমি খুব তাড়াতাড়ি মরছি না।
–তা মরবেন কেন? দুষ্ট লোকের প্রাণ কৈ মাছের মতো, সহজে যেতে চায় না।
শিরিন ধমকে উঠলেন– এসব কি বলছিস্ তুই, স্বপ্ন? নিজের বাবাকে সম্মান করতেও ভুলে গেছিস্।
– আমি খুনী-টুনিকে সম্মান করি না।
–তুই এই বাড়ি থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যা।
– যাচ্ছিই তো।
নেলী বললো– দাঁড়াও ভাইয়া। যাবার আগে সজল ভাইয়ের ঠিকানাটা দিয়ে যাও। তুমি তাকে কি বলে তাড়িয়েছো কে জানে। আমি তার সাথে একবার দেখা করতে যাবো।
সোলায়মান তিক্তস্বরে বললেন– নিজের মাথাটা তো গেছেই, সাথে ঐ নিরীহ ছেলেটার মাথাও বিগড়ে দিয়েছে।
স্বপ্নিল নেলীকে সজলের ঠিকানাটা লিখে দিলো। –মাঝে মাঝে দেখা করতে যাস্। ছোঁড়াটা খুব খুশি হবে।
নেলী বিরক্ত হয়ে বললো– তোমাকে অতো বক্তৃতা দিতে হবে না। কোন চুলায় যাচ্ছিলে যাও। সেই কখন থেকে বড্ডো বিরক্ত করছো।
স্বপ্নিল নেলীর মাথায় একটা গাট্টা মারলো।
–তুই আসলেই একটা পাজি। যাই মা। লিমা গেলাম। চঞ্চলটাকে তো দেখছি না। এখনও ঘুমাচ্ছে নাকি? ওকে একটু ডেকে নিয়ে আয় তো নেলী।
–অতো ডাকাডাকিতে কাজ নেই, যা তো।
স্বপ্নিল পোঁটলা কাঁধে ঝুলিয়ে উদাত্ত স্বরে 'একবার বিদায় দে মা' গাইতে গাইতে রওনা দিলো। সে গেট পেরুতেই সশব্দে কেঁদে উঠলো লিমা।
–আমার মুখ আর কখনো দেখতে এসো, মুখে মুড়ো ঝাড়ু মারবো।
স্বপ্নিল উচ্চস্বরে হাসতে লাগলো।
সে সত্যিই চলে গেলো।

তেইশ

বাসা খুঁজে পেতে বেশ খাটুনি গেলো নেলীর। গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই সজলকে দেখতে পেলো। উঠানে কলের পাশে দুখানি ইট পাশাপাশি রেখে তার উপর বসে আছে সে। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে দাঁতে নিমের মাজন ঘষছে।

–সজল।

চমকে ফিরে তাকালো সজল। মাটি থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। –আরে, আপনি এখানে?

ঠোঁট টিপে হাসলো নেলী। –বাড়ি ছেড়ে আসার আগে তো দেখা করে এলেন না, তাই নিজেই এলাম। বিরক্ত হলেন না তো?

– না না, একটুও না।

– কিন্তু আপনার তো সকাল সকাল ওঠার অভ্যাস। আজ এতো দেরি হলো যে?

– আর বলবেন না, সানোয়ার ছেলেটা অত্যন্ত বাচাল। সারারাত বক্‌বক্‌ করেছে।

– সানোয়ার কে?

– এই ঘরটাতে সাবলেট থাকে ও। আমি আপাতত এখানেই উঠেছি। কিছুদিন থাকবো। আচ্ছা, স্বপ্নিল ভাই কি সত্যিই চলে গেছেন?

– গেছে। ভাবী সেই তখন থেকেই কান্না-কাটি করছে। পাগলটা এমন সব কাজকর্ম করে না। আপনাকেও কি বলেছে কে জানে। বাবা খুব দুঃখ করছিলেন।

সজল অপ্রতিভ হয়ে পড়লো। মৃদুস্বরে বললো –সবাইকে বলে আসা উচিৎ ছিলো। কিন্তু বলতে গেলে চাচা যদি না আসতে দেন।

– আসারই বা কি দরকার ছিল? আমরা কি আপনার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম?

– কেন এসেছি সেটা আপনাকে বোঝাতে পারবো না নেলী।

– আরে আপনি অতো ঘাবড়ে গেলেন কেন? আমি আপনাকে বকাঝকা করতে আসিনি। কোথায় উঠেছেন সেটাই দেখতে এলাম। ঘরের ভিতর উঁকি দিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলো নেলী। –একি? দেখে তো মনে হচ্ছে না এখানে কোনো মানুষ বসবাস করে।

হেসে ফেললো সজল। –সানোয়ারের এসব দিকে তেমন কোনো লক্ষ্য নেই। আমাকেই একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে।

নিঃশব্দে হাসলো নেলী। –আপনি যে কেমন কাজের সেটাও আমার বোঝা হয়ে গেছে।

জায়েদ অফিসে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তারই বাসার বারান্দায় আধুনিকা, সম্ভ্রান্ত দর্শন একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়লেন তিনি।

–কাকে চান?

–আপনাকে নয়।

জায়েদ নার্ভাস হয়ে পড়লেন। – না, মানে...

ঈষৎ বিরক্ত হলো নেলী। –যাকে দরকার তাকে পেয়ে গেছি। আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন, যান তো।

কাচুমাচু ভঙ্গিতে সজলকে একনজর দেখেই সরে পড়লেন জায়েদ। নতুন ছেলেটাকে তিনি কপর্দকহীন অপগ- বলেই ধরে নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বানের জলেও পদ্ম ভাসে। তাজ্জব ব্যাপার।

সজল হাসতে হাসতে বললো– সানোয়ার থাকলে এখন কি করতো জানেন? আধ হাত জিভ বের করে ভেঙচি কেটে বলতো, শালা উড়নচ-ী বেত্তমিজ ।
নেলী হেসে উঠলো । –বেশ মজার মানুষ তো । আরেক দিন এসে তার সাথে পরিচিত হতে হবে ।
কয়েকটি নীবর মুহূর্ত কাটে । সজল বলার মতো কিছুই খুঁজে পায় না ।
হঠাৎ নিজের উপর একটু বিরক্ত বোধ করলো নেলী । এখানে আসার কোনো দরকার ছিলো না । স্রেফ তাৎক্ষণিক ইচ্ছার বশে চলে এসেছে সে । এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো অর্থ হয় না । –আসি সজল ।
এই আচমকা আসা যাওয়ার কোনো কারণ খুজে পায় না সজল । সে অবাক হয়ে বললো– এক্ষুনি যাবেন । একটু বসবেন না ।
হাসলো নেলী । –বসতে তো বলছেন । কিন্তু ঐ জঙ্গলের মধ্যে বসার তো কিছু দেখলাম না ।
–আপনি একটু দাঁড়ান, আমি বাড়িওয়ালার বাসা থেকে একটা চেয়ার আনছি ।
– না না, তার দরকার নেই । আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে । জরুরি কাজ আছে ।
সজল হতাশ হয়ে বললো– ঠিক আছে । আপনি এখানে একটু দাঁড়ান, আমি রিকশা ডেকে আনছি ।
– না না, তার দরকার নেই । নেলী রাস্তায় নেমে যায় । –কখনো ইচ্ছে হলে বাসায় চলে আসবেন, লজ্জা করবেন না । বাবা-মা খুব খুশি হবেন ।
সজল হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । এই মেয়েটিকে কিছুতেই বোঝা যায় না । এর সব ব্যবহারই এতো অপ্রত্যাশিত ।

চব্বিশ

স্বপ্নিলকে পোঁটলাসহ দেখে জহীর এবং তার স্ত্রী বিস্মিত হলো । স্বপ্নিল হাসিমুখে বললো– কেমন আছিস জহীর?
–ঘটনা কি তাই বল? কাঁধে পোঁটলা কিসের?
– এর মধ্যে আমার জামাকাপড় আছে । তোদের এখানে কিছুদিন থাকতে এলাম । ভাবী, আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না তো?
ঝুনু অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসলো । – জ্বি না, অসুবিধা কি । কিন্তু...
–বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম ভাবী । বাবা কারখানার একজন শ্রমিককে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে । আমি ভালো মানুষ, একজন খুনীর সাথে এক বাসায় কি করে থাকি বলুন? তাই গৃহত্যাগ করেছি । আপনাদের সাথে অল্প কিছুদিন থাকবো । একটা চাকরি বাকরি পেলেই চলে যাবো ।
জহীর বললো– তুই ভেতরে আয় । নাস্তা কর ।
ঝুনু বললো– ভাবী কোথায়?

–ওকে বাড়িতে রেখে এলাম। বাচ্চা হবে তো। নইলে ওকে নিয়ে আসতাম। আমি ভাই অন্যায়ের সাথে সমঝোতা করার মানুষ না।
জহীর অফিসে পৌঁছেই সোলায়মানকে ফোন করলো। –চাচা ঘটনাটা কি? স্বপ্নিলের কথাবার্তার কিছুই বুঝি নি আমি।
– ঘটনা কিছুই না। ওর মাথার গোলমালটা আবার বেড়েছে। তোমার ওখানে যখন উঠেছে তখন তুমি ওকে একটু দেখে শুনে রেখো।
– বলছে, চাকরি করবে।
– তাহলে সোবহান সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিও। আমি তাকে বলে রাখবো।
– ভাবীর বাচ্চা হবে শুনলাম–
–হ্যাঁ, মেয়েটা খুব কান্নাকাটি করছে। এই ছেলেটাকে নিয়ে আমি খুব সমস্যায় পড়েছি জহীর। এমন সব ঝঞ্জাট কাজকর্ম করে!
– আপনার কারখানায় কি সমস্যা হয়েছে চাচা?
– শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিলো। তুলে নিয়েছে। কেন, স্বপ্নিল কিছু বলেছে নাকি?
– ওর কথায় আমি কান দেইনি চাচা। ও বরাবরই এই রকম। সামান্য ব্যাপারকেও বড় করে দেখে।
– ওকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করো। বৌমার জন্যে হলেও ওর বাসায় ফেরা দরকার। তোমার চাচিও খুব কষ্ট পাচ্ছেন।
– বলবো চাচা।
জহীর ফোন রেখে দিলো। স্বপ্নিলকে সে ভালো করেই চেনে। ও সরল, কিন্তু উন্মাদ নয়। কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে, সন্দেহ নেই। অবশ্য এসব নিয়ে তার চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। সে আইনের মানুষ নয়।
স্বপ্নিল দুপুর পর্যন্ত রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে কাটালো। জহীর অফিসে গেছে, ঝুনু ঘরের কাজে ব্যস্ত। রাস্তায় অজস্র মানুষ, সবারই কোনো না কোনো ধরনের ব্যস্ততা আছে। তারই শুধু কোনো কিছু করার নেই। বিশ্রী ব্যাপার।
একটা হোটেলে ঢুকে সিঙ্গাড়া, চা খেলো স্বপ্নিল। চা'টা পানির মতো, কোনো স্বাদ নেই। মুখোমুখি বসে থাকা বৃদ্ধ ভদ্রলোক মিটিমিটি হাসছিলেন। তিনি বললেন– এই চায়ের দামই দু'টাকা। ভেবে দেখুন ব্যাপারখানা।
স্বপ্নিল বিরস মুখে বললো– এটাকে চা বলে কোন শালা। দুধ, চিনির চিহ্ন মাত্র নেই। চা বানায় আমাদের আলবার্ট। মধুর মতো।
বৃদ্ধ কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন– আলবার্ট কে?
– আমাদের কুক। এমনিতে হারামী পাবলিক। কিন্তু রাঁধে ভালো।
বৃদ্ধ অনেকক্ষণ স্বপ্নিলকে পর্যবেক্ষণ করলেন। –আপনার কি কোনো ব্যস্ততা আছে, বাবা?
–জ্বি না। আমার কোনো কাজই নেই। কোনো দিন ছিলও না। আমি হলাম আজন্ম অকর্মা...।
বৃদ্ধও তার সাথে হাসতে লাগলেন। –আপনি বেশ দিলখোলা মানুষ। চলুন না আমার বাসায়, জমিয়ে গল্প করা যাবে। আমি আবার রিটায়ার্ড কি না। গল্প করার মানুষ পেলে ছাড়তে চাই না। সামনের গলিতেই আমার বাসা। চলুন।
স্বপ্নিল এককথায় রাজি হয়ে গেলো। ভদ্রলোক উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তার নাম দেলোয়ার হোসেন। চমৎকার একটা বাড়ি রয়েছে তার। দুটি ছেলে দুটি মেয়ে। ছেলেরা দেশের বাইরে, এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। অন্য মেয়েটি একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করে। পথে যেতে যেতেই স্বপ্নিল তার

সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে ফেললো । দেলোয়ার সাহেবও জানতে পারলেন স্বপ্নিলের বাবা একজন খুনী, স্বপ্নিলের স্ত্রীর নাম লিমা, সে গর্ভবতী ।
দেলোয়ার সাহেবের ছোট মেয়েটি আজ অফিসে যায় নি । সকালের দিকে তার প্রচ- মাথা ধরেছিলো । মেয়েটার নাম জয়া । স্বপ্নিল তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো । এই মেয়েটা লিমার চেয়েও সুন্দরী ।

পঁচিশ

কয়েক দিন ধরে প্রচুর কেঁদেছে লিমা, এখন আর কাঁদতে ভালো লাগে না । সে সারাদিন মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়ায় । ইদানিং নেলীও নিয়মিত ভার্সিটিতে যাচ্ছে, তার ফিরতে প্রতিদিনই বিকাল হয়ে যায় । চঞ্চল আগের মতোই আছে, সে কখন বাসায় থাকবে না থাকবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই । সারাটা দুপুর প্রচ- নিঃসঙ্গতাবোধে কাতর হয়ে পড়ে লিমা । স্বপ্নিলের অভাবটা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায় । মানুষটার কোনো কাজ-কর্ম ছিলো না, দিনের অধিকাংশ সময়ই স্ত্রীর পাশে পাশে থাকতো । লিমার খুবই ভালো লাগতো ।
ড্রয়িংরুমে বসে একটা ম্যাগাজিনে মন দেবার চেষ্টা করছিলো লিমা । দুপুরের জন্য রান্নার একটি তালিকা আলবার্টকে দিয়ে এসেছে সে । বাকিটুকু আলবার্টই সুচারুভাবে সেরে ফেলবে । লিমার রান্নাঘরে কিছুই করার নেই ।
লিমার ফোন এলো ।
– ভাবী?
– হ্যাঁ! কেমন আছো শিলা?
- আমি ভালো । কিন্তু আপনি খুব একটা ভালো আছেন বলে তো মনে হচ্ছে না । গলাটা এমন ভারী কেন? আবার কান্নাকাটি করেছেন নাকি?
– না । কার জন্য কাঁদবো?
– স্বপ্নিল ভাইয়ের কোনো খবর পেয়েছেন?
– আছে ওর এক বন্ধুর বাসায় । পল্টনে । ওর কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না ।
– একদিন গিয়ে কান ধরে নিয়ে আসুন না ।
– আসবে না । ও হচ্ছে পাগলের সম্রাট । একবার যা মাথায় ঢুকেছে, মরে গেলেও তার অন্যথা করবে না । ওর আলাপ থাক । তোমার এবং চঞ্চলের কথা বলো ।
– চঞ্চলের সাথে গত তিন চার দিন আমার দেখাই হয় না ভাবী । কোথায় থাকে কে জানে? এদিকে বাসা থেকে আমার বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে । ভাবী, আপনি ওকে ভালো করে একটু বুঝিয়ে বলুন তো । এতো খামখেয়ালী হলে চলে?
– কিচ্ছু ভেবো না । তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি । আজই বাবাকে বলবো । ওর খামখেয়ালীপনা আমি ঘুচিয়ে দেবো ।
– দেখবেন আবার দেশত্যাগী না হয় ।
– সাহস থাকলে যাক না কোথায় যাবে । ঝাড়ুপেটা করবো না ।

শিলা হেসে ফেললো। –একমাত্র আপনিই ওকে সামলাতে পারবেন।
– চিন্তা করো না শিলা, এই দায়িত্ব আমি নিলাম।
লিমা ফোন রেখেই শিরিনের ঘরে চলে এলো। ব্যস্ত থাকার মতো কিছু একটা অন্তত পাওয়া গেছে। শিরিন চুপচাপ বিছানায় শুয়েছিলেন। নানান কারণে তার মনও ভালো নেই। স্বপ্নিল যে কারণে বাড়ি ছেড়েছে সেটা কতদূর সত্য তিনি জানেন না, জানার কোনো উপায়ও নেই। স্বামীকে এই সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার কথা তিনি চিন্তাও করতে পারেন না। তাদের দীর্ঘকালের সহাবস্থানে এই একটি শর্ত তিনি সব সময় মেনে চলেছেন, সোলায়মানের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কখনো অতিরিক্ত কৌতূহল দেখান নি। কিন্ত কখনো কখনো কৌতূহল দমন করাও কঠিন।
লিমাকে দেখে তিনি উঠে বসলেন। –এসো বৌমা। কে ফোন করেছিলো?
– শিলা। ওর বাসা থেকে বিয়ের জন্য খুব চাপ দিচ্ছে মা। আমাদের বোধ হয় এবার একটা কিছু করা উচিৎ।
শিরিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। –চঞ্চলটা তো কিছুই করে না বৌমা। ওর জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাই কি করে?
– ওসব নিয়ে ভাববেন না মা। দেখবেন বিয়ের পর চঞ্চল একদম সুবোধ বালক হয়ে যাবে।
–স্বপ্নিলটার সময়ও তো আমরা তাই ভেবেছিলাম। কি হলো?
– ওর কথা বাদ দেন মা। ওর মাথা ঠিক নেই। চঞ্চল ওরকম না। ঘাড়ে দায়িত্ব পড়লেই ও মানুষ হয়ে যাবে।
– ঠিক আছে তোমার বাবা এলে কথাটা বলো।
– কাজটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি...
শিরিন হাত তুলে ওকে থামালেন। – কে যেন তোমাকে ডাকছে। স্বপ্নিলের গলা না?
স্বপ্নিল গেটে দাঁড়িয়ে লিমাকে ডাকছিলো, শিরিনকে বের হতে দেখে সে গম্ভীর হয়ে বললো– খবরদার মা, আমাকে ভেতরে ঢুকতে বলবে না।
শিরিন রেগে গেলেন। – তোর এতো ভড়ং আমার ভালো লাগে না। নিজের বাড়িতে কেউ গেটে দাঁড়িয়ে থাকে? আয়, ভেতরে আয় বলছি।
–কক্ষনো না! তুমি লিমাকে ডেকে দাও। আমি ওর সাথে কথা বলেই চলে যাবো।
লিমা ড্রয়িংরুমে পর্দার আড়ালে ছিলো। সে গলা চড়িয়ে বললো– ওকে চলে যেতে বলেন মা। আমার কারো সাথে কথা বলার ইচ্ছা নেই।
স্বপ্নিল ধমকালো– এই লিমা, ভালো হবে না বলছি।
– ভালো হবার দরকারও নেই। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না।
– ঠিক আছে, চললাম। আর কোনোদিন আসবো না। কথাটা যেন মনে থাকে।
– এসো না। তোমার জন্য কারো পরান পুড়ে যাচ্ছে না।
স্বপ্নিলকে বাস্তবিকই চলে যেতে দেখে শিরিন পিছু নিলেন। – এই স্বপ্ন, যাস্নে বললাম। বৌমা ওসব রাগ করে বলেছে। স্বপ্ন!
স্বপ্নিল মায়ের ডাক শুনলো না। সে প্রায় ঘণ্টাখানেক এদিন-ওদিক হাঁটাহাঁটি করলো। লিমার সাথে কথা বলাটা খুবই দরকার। একটা পাবলিক টেলিফোন থেকে বাসায় ফোন করলো সে।
– লিমা?
– কি চাই?
স্বপ্নিল হাসতে লাগলো।
–খুব শয়তান হয়েছো তুমি।

– সারাদিন কি করো?
– দেলোয়ার হোসেন নামে এক বুড়োর সাথে খুব খাতির হয়ে গেছে। তার সাথেই আড্ডা মারি। বুড়োর একটা ফাইন মেয়ে আছে। জয়া। তোমার চেয়েও সুন্দর দেখতে।
– তাই নাকি! তাহলে তো বেশ সুখেই আছো। আর আমি এদিকে খামাখা কান্নাকাটি করে মরছি।
– ধ্যাৎ, কি যা তা বলো? ঐ মেয়ের সাথে আমার বন্ধুর মতো সম্পর্ক। শোন, একটা চাকরির জন্য চেষ্টা করছি। চাকরি পেলে একটা ফাইন বাসা ভাড়া করবো, তারপর তোমাকে নিয়ে আসবো। আসবে তো?
– না। তোমার সাথে আমি কোথাও যাবো না।
– কি আশ্চর্য! তাহলে আমরা এইভাবে আলাদা হয়ে থাকবো নাকি?
– আমি অতো কথা বুঝি না। মা খেতে ডাকছেন, এখন ফোন রাখতে হবে। তুমি ঐ জয়া না কি বললে ওর সাথে বেশি মিশবে না। শুনেছো?
স্বপ্নিল উচ্চস্বরে হাসতে লাগলো। –একশবার মিশবো।
– মিশো! মুখে ঝাড়ু মারবো!
লিমা ফোন রেখে দিলো। সত্যিই যদি স্বপ্নিল তাকে নিতে আসে তাহলে সে যে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একাকী থাকতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে।

ছাব্বিশ

নেলী বিকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে। কিছুক্ষণ এলোপাতাড়ি ঘুরলো সে। এক জায়গায় যেতে তার খুবই ইচ্ছা করছে, কিন্তু যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়াটা কি ঠিক? খুবই কঠিন প্রশ্ন! কোনটা ঠিক এবং কোনটা ঠিক নয়, এই প্রশ্নের উত্তর আপেক্ষিক। গেলে মন্দ হয় না। কিছুক্ষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর বাসাবোর দিকেই গাড়ি ছোটালো নেলী। একজন মানুষের সাথে দেখা করতে যাওয়ার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই।
সজল এবং সানোয়ার উঠোনে মাদুর পেতে বসেছিলো। বাসার সামনে গাড়ি থামতে দেখেই সজল বুঝলো, নেলী এসেছে। সানোয়ার বিস্ফারিত দৃষ্টিতে গাড়িটাকে দেখছিলো।
– ও সজল ভাই, এই পোড়াবাড়িতে গাড়ি নিয়ে কে এলো আবার?
– নেলী। স্বপ্নিল ভাইয়ের ছোট বোন।
– বলেন কি! কি সৌভাগ্য আমার । কোথায় বসানো যায় বলুন তো?
নেলী ভেতরে ঢুকলো না। সজলকে গাড়িতে তুলে নিলো। সানোয়ার গালভর্তি হাসি নিয়ে বললো– একটু বসলেনও না আপা। বড় দুঃখ পেলাম মনে। খেদমত করার সামান্য সুযোগও দিলেন না।
নেলী হেসে বললো– আরেক দিন এসে অনেকক্ষণ বসে যাবো।
– এক শুক্রবারে চলে আসেন আপা। আমি ফার্স্ট ক্লাস খিচুড়ি রান্না করতে পারি। একবার খেলে আরেকবার খেতে ইচ্ছে করবে। আপনাকে একদিন খাওয়াবো।
– ঠিক আছে আসবো। আপনার হাতের খিচুড়ি খেয়ে যাবো।

সজলকে নিয়ে একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ঢুকলো নেলী। সজল একেবারেই জড়োসড়ো হয়ে পড়লো। এই মেয়েটার মতিগতি বোঝার কোনো উপায় নেই। নেলী ওর অস্বস্তিকর অবস্থা দেখে নিচুস্বরে হেসে উঠলো। –আপনি অমন ঘামছেন কেন?
– না, ঘামবো কেন? আমার ঠিক ক্ষিধে নেই।
– শুধু স্যুপ খাবো, ক্ষিধে থাকবার কোনো দরকার নেই। আপনি একটু সহজ হয়ে বসুন তো। চারদিকে এতো লোকজন, আপনার এই হাল দেখলে সবাই কি ভাববে?
সজল হেসে ফেললো। – আমি যে ঢাকা শহরে নতুন, সেটা বুঝতে কারো বাকি নেই। ক্ষতি কিছু হলে আপনারই হবে।
– বেশ কথা বলতে শিখে গেছেন দেখছি। ন্যাপকিন দিয়ে মুখটা মুছে নিন। বিশ্রী দেখাচ্ছে।
সজল মুখ মুছলো। স্যুপের অর্ডার দিলো নেলী। চিকেন কর্ণ স্যুপ। সজল বললো– স্বপ্নিল ভাইয়ের খবর জানেন কিছু?
– আছে ওর এক বন্ধুর বাসায়। এক বুড়ো আর তার মেয়ের সাথে নাকি খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। ভাবীকে ফোন করে আবার সেই মেয়ের কেচ্ছা শুনিয়েছে। সেই থেকে ভাবীর মেজাজ খারাপ।
সজল হাসতে লাগলো। –ভাবী কিন্তু স্বপ্নিল ভাইকে খুব ভালোবাসেন।
– আপনি বুঝলেন কি করে?
– ওনাদের দুজনকে দেখলেই বোঝা যায়।
নেলী আচমকা বললো– আপনি কাউকে ভালোবাসেন?
সজল অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। নেলী কি কিছু টের পেয়েছে? সে কি নিজের অজান্তে এমন কোনো ব্যবহার করেছে যাতে নেলীর প্রতি তার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে? অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে নেলীর মুখে দৃষ্টি বোলালো সজল। নেলী ঠোঁট টিপে হাসছে। – কি হলো, কথা বলছেন না কেন? সত্যি করে বলবেন।
– আপনি এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করেন।
– এটা বুঝি অদ্ভুত প্রশ্ন হলো? আপনি কাউকে ভালোবাসতে পারেন না?
– ভালোবাসার মতো অবস্থা আমার নয়। আমার এখন একটা চাকরি দরকার।
– চাকরি পেলে ভালোবাসতে আপত্তি নেই?
সজল সলজ্জ ভঙ্গিতে বললো– এই আলাপটা বাদ দিন।
নেলী কুলকুলিয়ে হেসে উঠলো। – আপনার এই লাজুক ভাবটা আমার খুব ভালো লাগে।
বেয়ারা স্যুপ পরিবেশন করলো। সজলের স্যুপ খেতে ভালো লাগে না। তবুও সে খেলো। নেলী আজ খুবই ভালো মেজাজে আছে। এখন মেয়েটা খোঁচা দেবার কোনো সুযোগই ছাড়বে না।
নেলী বললো –চাকরির চেষ্টা করছেন?
– কয়েক জায়গায় দরখাস্ত দিয়েছি।
– বাবার কাছে যাচ্ছেন না কেন? কারখানার ঝামেলা মিটে গেছে। এখন গেলে নিশ্চয় কোনো একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।
– যেভাবে বাড়ি থেকে চলে এসেছি, তারপর চাচার সামনে যাই কি করে?
– আপনাকে আসতে বলছিলো কে? বড় ভাইয়া কি বললো না বললো, আর আপনি বাক্স পেটরা গুছিয়ে পালিয়ে এলেন।
– দোষটা স্বপ্নিল ভাইয়ের না। আমিই হঠাৎ একটা আবেগের বসে চলে এলাম।
– বাবা অবশ্য আপনার উপর রাগ করেন নি। আপনি তার অফিসে একবার যান।
– নাহ্। চাচার সামনে আমি যেতে পারবো না।

– তবে কি বছরের পর বছর ধরে চাকরি খুঁজে বেড়াবেন? কাছে টাকাপয়সা আছে বলেও তো মনে হয় না।
– আপনিই তো একদিন বলেছিলেন, নিজে চেষ্টা করা ভালো।
– আমি বলেছি বলেই আপনাকে তাই করতে হবে নাকি?
নেলীর চোখের হাসি হাসি ভাবটুকু সজলের দৃষ্টি এড়ালো না। খুব সম্ভবত ওর হৃদয়ের দুর্বলতা বুঝতে নেলীর বাকি নেই। সে খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলো। নিজেকে রীতিমতো অপরাধী মনে হচ্ছে তার। নেলী উঠে পড়লো। –চলুন আপনাকে পৌঁছে দেবো।
– দরকার নেই। আমি একাই যেতে পারবো।
– বাজে কথা বলবেন না। সাথে করে নিয়ে এসে পথেঘাটে ছেড়ে দেবো নাকি? আমাকে কি মনে করেন আপনি?
বাসাবোতে গেটের সামনে গাড়ি থামালো নেলী।
– যে কথাটা বলার জন্যে এসেছিলাম, সেটাই বলা হয়নি। ছোট ভাইয়ার বিয়ের ঠিক-ঠাক হচ্ছে। শিলা আপার সাথেই। গতকাল রাতে বাবা-মা গিয়ে প্রস্তাব দিয়ে এসেছেন। দিনক্ষণ অবশ্য এখনো ঠিক হয়নি। খুব সম্ভবত মাসখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে। আমি আপনাকে দাওয়াত করে যাবো। যাবেন তো?
সজল হাসলো। – আমার যাওয়া না যাওয়ায় কি আসে যায়।
– এই ধরনের কথাবার্তা বলবেন না তো! শুনলে রাগ হয়। আর একটা কথা, আপনার টাকা-পয়সার দরকার থাকলে আমাকে বলতে পারেন। আমি কিছু টাকা ঋণ দিতে পারি। দশ পার্সেন্ট সুদ দিতে হবে।
– এখনই দরকার নেই। যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবে, তখন হয়তো নেবো।
– কথাটা মনে থাকবে। আসি এখন। সানোয়ার ভাইকে বলবেন, একদিন এসে সত্যি সত্যিই তার হাতে খিচুড়ি খেয়ে যাবো।
গাড়িটাকে গলির শেষ মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করলো সজল। কেন ঝড়ের মতো এসে তার সবকিছু ওলোট-পালোট করে দিয়ে যায় মেয়েটা?

সাতাশ

স্বপ্নিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোবহান সাহেবকে পর্যবেক্ষণ করলো। এই ভদ্রলোক তার বাবার ব্যক্তিগত বন্ধু, তাদের মধ্যে যথেষ্ট সখ্যতাও রয়েছে। সুতরাং এখানে সে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে।
সোবহান সাহেব ছোটখাটো মানুষ, হাসিখুশি ধরনের। সহজ কণ্ঠে বললেন– বসো স্বপ্নিল।

স্বপ্নিল বসলো। গম্ভীর কণ্ঠে বললো– চাচা, আমি নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেতে চাই, বাবার পরিচয়ে নয়। আপনি আমার ইন্টারভিউ নিন।
সোবহান সাহেবও যথেষ্ট গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেন। – দেখো স্বপ্নিল, আমার একজন ভালো কর্মী দরকার। কারো বাবার পরিচয়ে আমারও কিছুই আসে যায় না। তুমি কি এখনই ইন্টারভিউ দেবে?
– জ্বি।
– বলো পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ শৃংগের নাম কি?
– এভারেস্ট।
– সবচেয়ে বড় দেশ?
– সোভিয়েত ইউনিয়ন।
– বাংলাদেশের আয়তন?
স্বপ্নিল কড়া চোখে তাকালো। – আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন?
সোবহান সাহেব স্মিত হেসে বললেন– তুমি পাশ করে গেছো।
– কিভাবে?
– আমি দেখতে চেয়েছিলাম তুমি রেগে যাও কিনা। তুমি রেগে গেছো। এই পোস্টে আমার একজন রাগী মানুষ প্রয়োজন। যদি চাও তাহলে আজ থেকেই জয়েন করতে পারো। আমার পার্সোনাল সেক্রেটারি তোমাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে। পারভীন।
স্বপ্নিলের কাজ অতি সামান্যই। অন্যদের কাজকর্ম তত্ত্বাবধায়ন করবে সে। তার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার বিন্দু বিসর্গ ব্যবহার করারও প্রয়োজন পড়বে না। স্বপ্নিল খুশীই হলো। বেশি পরিশ্রমের কাজ তার পছন্দ নয়। স্বপ্নিলকে একটি পৃথক কামরাও দেয়া হয়েছে। সুসজ্জিত। নীল রঙের একটা ডিজিটাল টেলিফোন সেটও রয়েছে। এয়ারকুলার। এলাহী অবস্থা।
স্বপ্নিল প্রথমেই বাসায় ফোন করলো।
– লিমা?
– স্বপ্নিল নাকি? আমি তোর মা। কেমন আছিস্ তুই?
– লিমাকে ডেকে দাও। আমি ওর সাথে কথা বলবো।
– কেন, আমার সাথে কথা বললে কি হয়? আমি কি করেছি?
স্বপ্নিল ফোন রেখে দিলো। ঠিক দু'মিনিট পর আবার রিং করলো সে। এবার লিমা ধরলো।
– তুমি মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করছো কেন? মা কাঁদছেন।
– আমি মার সাথে মোটেই খারাপ ব্যবহার করি নি।
– তুমি তার সাথে কথা বল নি?
– ইচ্ছে হয় নি। যে জন্যে ফোন করেছি সেটা শোন, এবার আমি একটা চাকরি পেয়েছি। সোবহান চাচার এখানে। ভালো মাইনে। কাজ কম। এই সপ্তাহের মধ্যে একটা ছোটখাটো বাড়ি ভাড়া করে ফেলবো। তখন কিন্তু তোমাকে চলে আসতে হবে।
– জ্বি না। মাকে একলা রেখে আমি কোথাও যেতে পারবো না।
– মাকে দেখাশোনা করার জন্য নেলী তো থাকছেই। তাছাড়া তুমি আমার বউ, আমার সাথে থাকবে।
– থাক, অতো স্বামীগিরি ফলাতে হবে না।
– আসবে তো? না এলে খামাখা বাড়ি ভাড়া করে কি লাভ?
– বাড়ি যদি পছন্দ হয় তাহলে ভেবে দেখা যাবে। অবশ্য বাবা-মা যদি অনুমতি দেন।
– মাকে বলো আমার ভুল হয়ে গেছে।

– কষ্ট দেবার সময় খেয়াল থাকে না। শোন, চঞ্চল এবং শিলার বিয়ে ঠিকঠাক হচ্ছে। এই মাসেই হয়ে যাবে। তুমি বড় ভাই, এই সময় বাড়িতে থাকা প্রয়োজন। অন্ততপক্ষে একবার এসে ঘুরে যাও।
– বাজে কথা বলো না। ঐ বাড়িতে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
– তা সম্ভব হবে কেন? দেলোয়ার সাহেবের বাড়িতে যাওয়া খুব সম্ভব, তাই না? সেখানে একখানা ডানাকাটা পরী আছে।
স্বপ্নিল হাঃ হাঃ শব্দে হাসতে লাগলো।
– তুমি খুবই পাজি মেয়ে। সুযোগ পেলেই খোটা দাও।
– বেশ করি। জয়া না কি যেন নাম, কেমন আছে সে?
– ভালো। আমাকে যত্ন করে মেয়েটা। গেলে আর ছাড়তেই চায় না।
– শুনে ধন্য হলাম। তোমার অফিসের ফোন নম্বরটা আমাকে দাও।
– উহুঁ। কাজের সময় ডিসটার্ব আমি একদম সহ্য করতে পারি না। নম্বর পেলেই তুমি যখন তখন রিং করতে শুরু করবে।
– করলে করবো। নম্বরটা দাও।
স্বপ্নিল নম্বর দিলো। –আজ থেকেই বাড়ি দেখতে লেগে যাচ্ছি কিন্তু।
– যা খুশি করো। আমার এসব জেনে কোনো দরকার নেই, রাখি।
লিমা ক্রাডলে রিসিভার নামিয়ে রেখেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। চাকরিটার ব্যাপারে স্বপ্নিলের যে কোনো রকমের সন্দেহ হয় নি, এটা সত্যিই সৌভাগ্যের ব্যাপার। সে কদিন খুব ভয়ে ভয়ে ছিলো। লিমা সোলায়মানের অফিসে ফোন করে তাকে খবরটা জানিয়ে দিলো।

আঠাশ

সানোয়ার অফিসে চলে গেছে। সজলের কোনো কাজ নেই। এই সময়টা সে জায়েদ সাহেবের ছোট ফুলের বাগানটা পরিচর্যা করে কাটায়। আজ তাও ভালো লাগছে না। বাড়ি থেকে বেশকিছু দিন হলো কোনো খবর আসছে না। তার নতুন ঠিকানা অবশ্য জানানো হয় নি। কিন্তু ও বাড়িতে চিঠিপত্র কিছু এলে নিশ্চয় পৌঁছে দিয়ে যেতো।
একটি স্বাস্থ্যবান ছেলে গেটে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে –সজল ভাই, এই সজল ভাই।
সজল বেরিয়ে এলো। ছেলেটা তার অপরিচিত।
– কাকে চাও?
– আপনি সজল?
– হ্যাঁ।

ছেলেটা ভেতরে ঢুকলো। তার বয়েস বড়জোর পনের ষোল, সুন্দর চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ যথেষ্ট মূল্যবান। সজল কিছুই বুঝতে পারছে না। এই ছেলে তার কাছে কি চায়?
– আমার নাম চপল। আমাকে স্বপ্নিল ভাই পাঠিয়েছেন।
– স্বপ্নিল ভাই? কেন?
– আমাদের বাসায় একজন প্রাইভেট টিউটর প্রয়োজন। আমার ছোট দুবোনকে পড়াতে হবে। ক্লাশ ফাইভ ও সিক্স। স্বপ্নিল ভাই আপনার কথা বললেন।
সজল চমৎকৃত হয়ে গেলো। – তোমাদের বাসা কোথায়?
– এলিফ্যান্ট রোডে। আপনার জন্য বেশ দূর হয়ে যাচ্ছে অবশ্য। কিন্তু স্বপ্নিল ভাই বললেন, আপনি ভালোই পড়ান। সেজন্য মা আপনাকে ডাকতে পাঠালেন।
– কিন্তু আমি তো কখনো টিউশনি করিনি।
– তাতে কি? দু'তিনদিন পড়ালেই দেখবেন এটা পানির মতো সোজা কাজ। তৈরি হয়ে নিন। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। গাড়িটা সামনের মোড়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। চলুন।
চপলদের নিজস্ব বাড়ি আছে। দোতালা দালান। বাসায় ঢুকলেই বোঝা যায়, এদের অবস্থা অত্যন্ত ভালো। প্রতিটি আসবাবপত্রই মূল্যবান, রুচিকর। একজন মধ্যবয়সী সুশ্রী মহিলা দরজা খুলে দিলেন। চপল বললো– মা, সজল ভাই।
ভদ্রমহিলা স্মিত হাসলেন। – ভেতরে এসো বাবা। বসো।
সজলকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে বেশ কিছু প্রশ্ন করলেন তিনি। তার বাড়ি কোথায়, বাবা কি করেন, চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছে কিনা– এই জাতীয়। সজল খুব গুছিয়ে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারছে না। সে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছে। স্বপ্নিল ভাই তার কথা বললো, আর এরা বাড়ি গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এলেন। কোথায় যেন একটা অসামঞ্জস্যতা আছে।
ভদ্রমহিলা বললেন– আমার মেয়েরা স্কুলে গেছে। ওরা পড়াশুনায় মোটামুটি ভালো। তবু আমি চাই ওদেরকে গাইড করার জন্য কেউ একজন থাকুক। তোমাকে আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে। তুমি আগামীকাল থেকেই আসো। বিকালের দিকে এলে ভালো হয়। বেতন আপাতত দেড় হাজার করে পাবে। তোমার যদি টাকাপয়সার প্রয়োজন থাকে তাহলে কিছু এডভান্স নিয়ে যেতে পারো। নেবে?
– জ্বি না। পড়াতে পারবো কিনা আগে দেখে নেই।
– পারবে বাবা পারবে। ক্লাস ফাইভ-সিক্সের মেয়েদের পড়ানো একটা সমস্যা নাকি?
সজল আগাম টাকা নিলো না। এই পরিবার তার প্রতি এতোখানি সদয় কেন হচ্ছে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সানোয়ার খবর শুনেই লাফিয়ে উঠলো। –মাইরী, আপনি তো দুনিয়া জয় করে ফেলেছেন। ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে চাকরি দিচ্ছে। কি পাগল।
–স্বপ্নিল ভাই বলেছেন, তাই হলো।
–স্বপ্নিল ভাই আমার জন্যেও অনেককে বলেছিলেন, কোথাও কিচ্ছু হয় নি। শেষে এই কাজটা আমি নিজে অনেক খেটে খুটে জোগাড় করলাম। আসল কথা হচ্ছে ভাই কপাল। কি কপাল নিয়েই যে জন্মেছিলেম। চলুন, এই আনন্দে আজকে ইভেনিং শো মেরে দেই।
– দরকার নেই। আপনার কতগুলো টাকার শ্রাদ্ধ করা হবে।
– তা হোক। আপনিও আগামী মাসে একটা দেখিয়ে দেবেন। চলেন, চলেন। হাতে সময় বেশি নেই।

ঊনত্রিশ

নেলী অস্থির পায়ে অন্ধকার ছাদে পায়চারি করছিলো। বিশ্রী একটা মানসিক অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে সে। একটা ছেলে তার প্রতি প্রচ- আগ্রহ দেখাচ্ছে। তার বান্ধবীর বড়ভাই। শিহাব আহমেদ। সুদর্শন, দীর্ঘদেহী মানুষ। সপ্রতিভ। ভালো চাকরি করছে। যেঁচে এসে পরিচিত হয়েছে। শিহাবকে অপছন্দ করার কিছু নেই। নেলী ভেতর থেকে তেমন কোনো আগ্রহ অনুভব করছে না। কারণটা কি?
কারণটা নেলীর অজানা নয়। আজ বিকালে সজলের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলো সে। সজল বাসায় ছিলো না। থাকলে ভালো হতো। সজলকে বলার মতো তার কিছু কথা ছিলো, এমন কিছু কথা, যা হয়তো সজল কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু নেলী নিজের হৃদয়কে বুঝতে ভুল করেনি।
নিজের উপরই বিরক্ত হয় নেলী। কি অদ্ভুত ধরনের একটা সমস্যা। সজলের মতো একজনের প্রতি তার দুর্বলতা জন্মালো কিভাবে? সাধারণ দর্শন, লাজুক ধরনের একজন, সামাজিকভাবে নেলীর কাছাকাছি আসার ক্ষমতা অথবা প্রয়াস কোনোটাই যার নেই। কেন সজলকে তার ভালো লাগলো? কেন শিহাবের কথা ভাবতে গেলেই সজলকে মনে পড়ছে? এই অসঙ্গত, অবাঞ্চিত ভালোবাসা নিয়ে সে কি করবে?
নেলীর কান্না আসছে। অনেকগুলো দিন সে কোনো পুরুষের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকায়নি, তীব্র একটা বিদ্বেষ পুষে রেখেছিলো মনের মধ্যে। অনেক পুরুষই কিছুই না বুঝে তার দিকে হাত বাড়িয়েছে, আঘাত পেয়ে চুপিসারে সরেও গেছে। কিন্তু সজলই সব ওলোট-পালোট করে দিলো। এক ধরনের সশ্রদ্ধ ভালোবাসায় নেলীর হৃদয়ের অনেক ক্ষোভ দূর করে দিয়েছে।
কিন্তু সজলকে নিয়ে আগামী দিনের স্বপ্ন দেখা কি তার জন্য শোভা পায়? কেউ তার সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না। সম্ভবত সজল নিজেও পিছিয়ে যাবে। সজলের ভালোবাসায় অনুরাগের চেয়ে শ্রদ্ধার ভাবটুকুই প্রকট, সে কোনো অবস্থাতেই নেলীকে কোনো অবাঞ্চিত পরিস্থিতিতে টেনে নিয়ে যাবে না।
লিমা ছাদে উঠে এসেছে। নেলীর পাশে এসে দাঁড়ালো সে। নেলী বললো– ঘুম আসছে না ভাবী?
– তোমাকে এমন অস্থির দেখাচ্ছে কেন?
– অস্থির? কই না তো!
– মিথ্যে বলো না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমার কিছু একটা হয়েছে। আমি তোমার বান্ধবীর মতো, আমাকে বলো।
– সত্যি বলছি ভাবী আমার কিছু হয় নি।
– ইদানিং তোমার খুব ফোন আসছে দেখলাম।
নেলী হাসলো –হ্যাঁ। শিহাব নামে একটা ছেলে খুব জ্বালাচ্ছে।
– দেখতে কেমন?
– খুবই ভালো। যদি দেখতে চাও তো একদিন বাসায় আসতে বলি।
– আমার দেখা না দেখায় কি আসে যায়। তোমার পছন্দ হলেই হলো।
– আমার পছন্দ কি না সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

লিমা কিছুক্ষণ চুপ থাকলো। – আমার কানে একটা কথা এসেছে। যদি কিছু মনে না করো তাহলে জিজ্ঞেস করি।
– অতো ভনিতা করছো কেন ভাবী? তোমার কাছে তো আমি কিছু লুকাই না।
– তুমি নাকি প্রায়ই সজলের ওখানে যাও?
– কার কাছে শুনলে?
– যাও কি না তাই বলো?
– গেছি দু-তিন দিন। তাতে কি হয়েছে?
– না, কি হবে? এমনিই জানতে চেয়েছিলাম।
– কথা ঘুরিও না, ভাবী। অকারণে তুমি কিছু জিজ্ঞেস করার মানুষ নও।
– আমার মনে হয় সজলকে নিয়ে তুমি একটা সমস্যায় ভুগছো।
নেলী হেসে উঠলো। – জানতাম তোমার চোখে ধুলো দেয়া যাবে না।
– ঘটনাটা কি নেলী?
– তেমন কিছু না। সজলের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা জন্মে গেছে।
– ও সেটা জানে?
– মনে হয় না। তবে আমি ওরটা জানি।
লিমা একটু চিন্তা করে বললো– অসম্ভব চিন্তা ভাবনা করো না নেলী। বরং শিহাবকে একদিন বাসায় নিয়ে এসো পরিচিত হই।
নেলী মৃদুশব্দে হাসলো। – ভয় পেও না ভাবী। নিজের ভালোটা অন্তত আমি বেশ বুঝি।
– সজলের ওখানে তাহলে আর যেও না। ছেলেটা খারাপ নয়। কিন্তু তোমার নিজের কারণেই যাওয়া উচিৎ নয়।
নেলী চাপা নিঃশ্বাস ছাড়লো। – না গিয়ে বোধ হয় থাকতে পারবো না, ভাবী। আমাকে তো চেনই।
চঞ্চলকে দেখেই তাদের আলাপ থেমে গেলো। লিমা ধমকে উঠলো– এই, তুমি আবার এখানে কি চাও?
– তোমাদের গোপন আলাপ শুনতে এলাম। নিশচয় কুঝ্ঝটিকা বেগমের নতুন কোনো সমস্যা হয়েছে?
নেলী বিরক্ত স্বরে বললো, ভাইয়া তুই যা তো।
– সমস্যাটা কি বল না? আমি হয়তো কোনো সাহায্যও করতে পারি।
লিমা কড়া স্বরে বললো– সবার ব্যাপারেই তোমার নাক গলানো চাই, না? যাও, ঘরে বসে শিলার কথা ভাবো।
চঞ্চল গেলো না। লিমার পাশে এসে দাঁড়ালো।
– ঘটনাটা কি?
কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিলো না। চঞ্চল মন খারাপ করলো না। সে নাটকীয় ভঙ্গিতে লিমার একখানা হাত ধরে হেঁড়ে গলায় 'এই রাত তোমার আমার' গাইতে শুরু করলো। লিমা হাসতে হাসতে তার পিঠে একখানা আদুরে কিল বসালো।

ত্রিশ

সজল দুজন চমৎকার ছাত্রী পেয়েছে। খুবই শান্তশিষ্ট। তাদের নাম রুমা, ঝুমা। সজলের প্রতি তাদের সহানভূতির কোনো অভাব নেই। স্যারের মায়ের অসুখ শুনে তাদের চোখে প্রায় পানি এসে গেলো। শুধু একটিই অসুবিধা। সজলের সাথে তাদের অধিকাংশ আলাপই হয় পড়াশুনার বাইরের। প্রায় ক্ষেত্রেই গল্পের বই নিয়ে। হুমায়ূন আহমেদের অত্যন্ত ভক্ত রুমা, ঝুমা। ভদ্রলোক সম্বন্ধে তাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। সজলকে বেশ অস্বস্তিতে পড়তে হয়। এতো কোমল দুটি মেয়েকে ধমক দিতেও তার খারাপ লাগে। তাদের মা অবশ্য ব্যাপারটিকে প্রশ্রয়ের চোখে দেখছেন। হেসে বলেন– সব সময় পড়তে আর কারই বা ভালো লাগে। তুমি ওদের সাথে নানান বিষয় নিয়ে গল্প স্বল্প করবে। ওদের জ্ঞানের পরিধি বাড়বে।

সজলের সন্দেহ ঘনিভূত হতে থাকে। দেড় হাজার টাকা যাকে মাসে মাসে দিতে হবে তার প্রতি এতখানি উদার হবার কোনো কারণ নেই। এর পেছনে নিশ্চয় অন্য কোনো রহস্য আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই বিষয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না। রুমা, ঝুমা ছেলেমানুষ, তাদের সাথে এই বিষয়ে আলাপ করার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া মেয়ে দুটিকে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মনে হয়। তারা সহজে রহস্য ফাঁস করবে সেই ভরসাও নেই।

পাঁচ দিনের দিন রুমা-ঝুমার বাবা নিয়ামত সাহেব তাকে একটি চমৎকার প্রস্তাব দিলেন। তিনি গম্ভীর মানুষ, খুব সংক্ষেপে বললেন– আমাদের ব্যাংকে আমরা কয়েকজন নতুন কর্মচারি নিচ্ছি। আপনি এপ্লাই করুন। কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। কিন্তু চেষ্টা করবো।

সজল হতবাক হয়ে গেলো। এরা কেন তার জন্য এতো কিছু করছেন? স্বপ্নিলের একটা অনুরোধ কি এদের কাছে এতো মূল্যবান। সজলকে বিস্মিত হতে দেখে ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন।

– তোমার এতো অবাক হবার কোনো কারণ নেই। আমি স্বপ্নিলের দূর সম্পর্কের চাচা হই। ওর বাবা এক সময় আমাকে নানান ভাবে সাহায্য করেছিলেন।

– তবে কি সোলায়মান চাচা ...

– এতো কিছু আমার কাছে শুনতে চেও না। তুমি কালই একটা এপ্লিকেশন করো। তোমার চাকরিটা যেন হয় সেই ব্যাপারে আমি বিশেষভাবে চেষ্টা করবো।

নেলী একটা স্ন্যাক শপে দাঁড়িয়েছিলো। তার হাতে একটা কোল্ড ড্রিংকস। সামান্য খানিকটা খেয়েছে সে। তার সম্পূর্ণ মনোযোগ সামনের গলিতে। সজলের এতক্ষণে বেরিয়ে আসার কথা। রাত আটটার কিছু বেশি বাজছে। দেরি হবার কি কারণ?

সজলকে বের হতে দেখেই হাতের বোতলটা সরিয়ে রাখলো নেলী। দাম মিটিয়ে দিয়ে ফুটপাথে এসো দাঁড়ালো। তাকে দেখে সজলের দৃষ্টি বিস্ফারিত হলো। –আপনি?

নেলী হাসলো। –শপিং করতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

– আমি ঐ বাসায় টিউশনি করাই।

– কতদিন ধরে?

– দিন পাঁচেক হলো। স্বপ্নিল ভাই এদেরকে আমার কথা বলেছেন। শুনলাম আপনাদের আত্মীয় হন।

– হ্যাঁ, দূরসম্পর্কের চাচা। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই।

সজল হাসলো। – 'না' বললে তো আপনি শুনবেন না।

– এতোদিনে তাহলে চিনতে পেরেছেন। আসুন।

নেলী নিউ এয়ারপোর্টের দিকে গাড়ি ছোটালো। সজল অবাক হয়ে বললো – কোথায় যাচ্ছেন?

– এই রাস্তায় গাড়ি চালাতে খুব মজা লাগে। আপনার তো বাসায় কোনো কাজ নেই। একটু ঘুরি।

সজল আপত্তি করলো না। নেলী খুব ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে। তাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। সজল বললো –নেয়ামত সাহেব আমাকে তার ব্যাংকে এপ্লাই করতে বললেন।
– অবশ্যই করবেন। উনি যদি কোনো রকম আশা দিয়ে থাকেন তাহলে জানবেন চাকরি আপনার হয়ে গেছে।
কিছুক্ষণের নীরবতা। নেলী হঠাৎ বললো– আপনার মায়ের শরীর কেমন?
– জানি না। আমার নতুন ঠিকানা জানিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, কোনো জবাব আসেনি। সম্ভবত ভালোই আছেন। খারাপ কিছু হলে নিশ্চয় খবর আসতো।
– ছোট ভাইয়ার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। যথা সময়ে আপনার ঠিকানায় নিমন্ত্রণপত্র চলে যাবে।
সজল হেসে বললো –আমাকে ওসব পাঠানোর দরকার কি? মুখে বললেই তো যথেষ্ট।
– যাবেন?
– যাবো। চাচা-চাচির কাছে মাফ চাওয়ার জন্যেও একবার যাওয়া দরকার।
– আপনি গেলে বাবা মা খুব খুশি হবেন।
এয়ারপোর্টের ভেতরে গাড়ি ঢোকালো নেলী। ঢালু সড়ক ধরে উপরের দর্শক গ্যালারীতে চলে এলো। গাড়ি থামালো।
– এখানে কিছুক্ষণ বসি। আপত্তি নেই তো?
– না, আপত্তি কিসের!
সম্ভবত কিছুক্ষণের মধ্যে আন্তর্জাতিক কোনো ফ্লাইট নেই। কারণ এয়ারপোর্ট প্রায় শূন্য। অল্প কয়েকজন কম বয়েসী ছেলেমেয়েকে দেখা গেলো শুধু। গাড়ি নিয়ে এসেছে তারা। উচ্চ ভলুমে গান চালিয়ে দিয়ে গল্প করছে।
নেলী রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। –আপনাকে একটা কথা বলার আছে। কয়েকদিন আগে দেখা করতে গিয়ে ছিলাম, আপনি বাসায় ছিলেন না।
– হ্যাঁ, জায়েদ সাহেব আমাকে বলেছিলেন।
– কথাটা কি ধরনের হতে পারে আন্দাজ করতে পারেন?
– না। আমার কল্পনা শক্তি খুব কম।
– একটি ছেলে আমার প্রেমে পড়ে গেছে। গভীর প্রেমে।
সজলের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। নেলী কি তাকেই নির্দেশ করছে? এই মেয়ের জন্য এটা খুব অসম্ভব নয়। মানুষকে নাজুক অবস্থায় ফেলবার জন্য এই ধরনের কথা সে সহজেই বলতে পারে।
নেলী গম্ভীর মুখে বললো– ছেলেটার নাম শিহাব। সুদর্শন, স্মার্ট, ভালো চাকরি করে। কদিন ধরে খুব জ্বালাচ্ছে আমাকে।
সজল অবাক হয়ে বললো –এইসব কথা আমাকে বলছেন কেন?
– আপনার হিংসে হচ্ছে না?
– কাকে?
– শিহাবকে?
– নেলী, আমি বুঝতে পারছি না কেন এই ধরনের কথাবার্তা বলছেন? শিহাব সাহেবকে হিংসা করবারই বা আমার কি কারণ থাকতে পারে!
নেলী নিষ্পলক চোখে সজলের দিকে তাকিয়ে আছে। সজল ঘামতে শুরু করলো। এই মেয়েটা আজ এমন অদ্ভুত আচরণ করছে কেন?
নেলী মৃদুকণ্ঠে বললো– সত্যি করে একটা কথা বলবেন?
– বলুন।

– আমার প্রতি আপনার দুর্বলতা নেই?
সজল উত্তর দিলো না।
নেলী বললো, আপনার নিজেকে অপরাধী মনে করার কিছু নেই। সুন্দরী মেয়েদের প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা প্রায় ছেলেদেরই থাকে।
সজল করুণ স্বরে বললো –চলুন, ফেরা যাক।
নেলী তার কথা না শোনার ভান করলো। –আমি চাই আপনি শিহাবকে একবার দেখুন। আপনি যদি তাকে পছন্দ করেন তাহলে আমিও তাকে নিয়ে আরেকটু গুরুত্ব সহকারে চিন্তা ভাবনা করবো।
–আশ্চর্য! আমার পছন্দ অপছন্দে আপনার কি আসে যায়?
– অনেক কিছুই আসে যায়। ছেলেদের প্রতি আমার যে বিদ্বেষটা ছিলো, বলা যায় আপনিই সেটাকে খানিকটা কাটিয়ে দিয়েছেন। যে সময় আমার একজন বন্ধুর খুব প্রয়োজন ছিলো, তখন ভাগ্যক্রমে আপনাকে পেলাম। সব মিলিয়ে আপনার প্রতি আমার একটা অধিকার বোধ জন্মে গেছে। সুতরাং আমার কিছু কিছু অত্যাচার আপনাকে সহ্য করতেই হবে।
সজল হতাশ হয়ে বললো –ঠিক আছে। শিহাব সাহেবের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন। অবশ্য আমার পরিচয় পেলে উনি হয়তো অপমানিত বোধ করবেন।
– যদি করে তাহলে আউট। নেলী অকারণে হাসতে লাগলো।
সজল বললো– চলুন, ফেরা যাক।
– চলুন।
রাতে ঘুম হলো না সজলের। নেলী তাকে যে যন্ত্রণার আবর্তে টেনে নিয়ে চলেছে তা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় সে দেখছে না। একটা অবাঞ্ছিত ভালোবাসা তার হৃদয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে দৃঢ়ভাবে আসন গেড়ে বসেছে। নেলীর কথা অথবা অভিব্যক্তি কোনোটাই সে বোঝে না। মেয়েটা কি তাকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়? নাকি তার জন্য নেলীরও কিছুটা দুর্বলতা আছে? এই ধরনের চিন্তা করতে সজলের সাহস হয় না। অসম্ভব কল্পনা মনে হয়।

একত্রিশ

বেলা এগারটা। এই সময়টা সজলের সবচেয়ে খারাপ লাগে। জায়েদ সাহেবের ছেলেমেয়েগুলো সবাই স্কুলে চলে গেছে। তার স্ত্রীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, ঠিকে ঝি টার সাথে সারাদিনই খিট মিট লেগে থাকে তার। সজলের কথা বলার মতো কেউ নেই। ভাবছিলো বাইরে থেকে একটু হেটে আসবে, এমন সময় গেটের সামনে একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি এসে থমকে দাঁড়ালো। স্বপ্নিল ভেতরে ঢুকেই হৈ চৈ করে উঠলো– সজল, জলদি তেরি হয়ে নাও।
– কি ব্যাপার স্বপ্নিল ভাই?

–একটা নতুন বাড়ি নিয়েছি। লিমাকে আনতে যাচ্ছি আজকে। তুমিও আমার সাথে চলো। হাজার হোক গৃহ প্রবেশ। পরিবারের সবারই থাকা খাওয়া দরকার।
– আমার কি না গেলেই নয়?
– একদম বাজে কথা বলবে না। জলদি কাপড় পালটাও। হাতে সময় খুব কম।
সজল ট্যাক্সিতে উঠে জানতে চাইলো – ভাবীকে বলেছেন?
– ওকে আবার বলাবলির কি আছে?
– যদি হঠাৎ করে না আসতে চান?
– না এলে আমিও সারাদিন বাড়ির সামনে ট্যাক্সি নিয়ে বসে থাকবো। আমি ভাই সেয়ানা পাবলিক। হাঃ হাঃ
সজলকে দেখে শিরিন খুবই অবাক হলেন। –সজল, কেমন আছো বাবা? সেই যে গেলে আর একদিনের জন্যেওতো এলে না।
সজল লজ্জিত স্বরে বললো –আপনাদের কাছে আমি অনেক অন্যায় করেছি চাচি। আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।
–ঠিক আছে বাবা ক্ষমা চাইবার কোনো দরকার নেই। তুমি কেমন ছেলে সে আমি জানি। বাড়ি থেকে চিঠি-পত্র পেয়েছো? তোমার মায়ের শরীর কেমন?
– এখনো কোনো খবর পাইনি। বোধহয় ভালো আছে।
– তুমি বসো আমি বউ মাকে ডেকে দেই।
– চাচি স্বপ্নিল ভাইও এসেছেন।
– স্বপ্ন। কোথায় ও?
ট্যাক্সিতে বসে আছেন। ভাবীকে নিয়ে যেতে এসেছেন।
– কোথায়?
– উনি একটা বাড়ি ভাড়া করেছেন।
শিরিন লিমাকে ডাকলেন। –স্বপ্ন তোমাকে নিতে এসছে।
লিমা অবাক হয়ে বললো– কই আমাকে তো কিছুই বলেনি। কোথায় ও?
– ট্যাক্সিতে।
লিমা সজলের সাথে ট্যাক্সি পর্যন্ত এলো। স্বপ্নিল তাকে দেখেই মধুর এক টুকরো হাসি উপহার দিলো।
– তোমার ঘর বাড়ী সব রেডি। জলদি জামা-কাপড় গুছিয়ে নাও। আধ ঘন্টার বেশি সময় দিতে পারবো না। অফিসে অনেক কাজ।
– দেখো, পাগলামিরও একটা সীমা থাকা উচিৎ। বলা নেই কওয়া নেই তোমার সাথে চলে গেলেই হলো? বাবা, চঞ্চল, নেলী কেউ বাসায় নেই।
– ওরা সবাই সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় চলে গেলেই হলো! তুমি মাকে বলে দাও। স্পেশিয়াল দাওয়াত, রাতে সুপার স্পেশিয়াল খানা। সমস্যা মিটে গেলো।
লিমা বিরক্ত মুখে বললো – আমি এখন যেতে পারবো না। বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। তুমি বরং সন্ধ্যাবেলায় এসো।
– আরে বাহ্, বাসাটাকে গোছগাছ করতে হবে না? তুমি ঝামেলা না করে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। সজল তোমার ভাবীকে একটু সাহায্য করো।
– বললামতো এখন যাওয়া সম্ভব না।
– ঠিক আছে। তাহলে আমিও এখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্যাট মেরে বসে থাকলাম।
– পাগলের মতো কথা বলো না তো।

– আমি এক কথার মানুষ ।
লিমা বিরক্ত হয়ে চলে গেলো । দশ মিনিটের মধ্যে বাক্স গুছিয়ে ট্যাক্সিতে চড়লো সে । শিরিন শুকনো মুখে ট্যাক্সি পর্যন্ত এলেন ।
– স্বপ্ন, কাজটা তুই ভালো করলি না ।
স্বপ্নিল মায়ের হাতে একটা শাড়ি ধরিয়ে দিলো ।
– এটা তোমার জন্য এনেছিলাম । তুমি সবাইকে বলো আজ রাতে আমার বাসায় দাওয়াত । আমি ট্যাক্সি নিয়ে আসবো ।
শিরিন মৃদু স্বরে বললেন– কেন আমাদেরকে এভাবে অপমান করছিস্ বাবা?
– এতে অপমানের কি দেখলে মা! আজ আমাদের গৃহ প্রবেশ, তোমরা না থাকলে চলবে কেন । আমি ঠিক সাতটার সময় ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসবো । তোমরা রেডি থেকো ।
লিমা রুক্ষস্বরে বললো –ট্যাক্সি নিয়ে আসতে হবে না । মাকে বাসার ঠিকানাটা দিয়ে যাও ।
স্বপ্নিল একটা কার্ড বের করে শিরিনের হাতে ধরিয়ে দিলো । –নিচে বাসার ঠিকানা আছে, মা । তোমরা কিন্তু অবশ্যই যাবে । যদি আটটার মধ্যে না যাও তাহলে আমি ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসবো ।
সে গাড়ি ছাড়তে বললো । লিমা নিচুস্বরে ক্ষেদোক্তি করলো– ছিঃ এমন পাগলের সংসার করছি ভাবতেও লজ্জা করছে ।
স্বপ্নিল হো হো করে হাসতে লাগলো । – পড়েছো মোঘলের হাতে খানা খেতে হবে একসাথে হাঃ হাঃ–
লিমা ধমকে ইঠলো– অতো হা-হা হো হো করতে হবে না । চুপ করে বসে থাকো ।
স্বপ্নিল খুব তাড়াহুড়ো করে অনেকগুলো কাজ করেছে । প্রথমত, একটা বাড়ি পছন্দ করতে হয়েছে । দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কিনতে হয়েছে । তৃতীয়ত, ঘরকন্যার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করতে হয়েছে । কোনো কিছুই গোছানো হয়নি । বাসাটাকে একটা ছোটখাটো জঙ্গলের মতো দেখাচ্ছে ।
লিমার বাড়ি পছন্দ হলো না । সে বিরক্ত মুখে বললো– এমন বাড়ির মুখে মানুষ ঝাড়ু মারে ।
স্বপ্নিল উদাত্ত স্বরে বললো –চিন্তার কিছু নেই । এক হালি ঝাড়ুও কেনা হয়েছে ।
সজল হেসে ফেললো । সেজন্য তাকে একটা ধমকও খেতে হলো –সজল ভাই, হাসবেন না তো । আমার খুব রাগ হচ্ছে । কথা নেই বার্তা নেই এই জঙ্গলের মধ্যে এনে হাজির করলো ।
সজল বললো – চিন্তা করবেন না ভাবী । ঘন্টা খানেকের মধ্যে সব গুছিয়ে দিচ্ছি । আসেন স্বপ্নিল ভাই ।
স্বপ্নিল হাত গোটালো । –বান্দা হাজির । আমরা কেমন কাজের মানুষ সেটা তোমার ভাবীকে একবার দেখিয়ে দেয়া দরকার ।
লিমা মুখ বাঁকালো ।
চঞ্চল বিকালেই চলে এলো । লিমা রান্না বান্নায় ব্যস্ত ছিলো । সে সরাসরি তার পাশে চলে গেলো ।
– ভাবী, তোমার কোনো ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমাকে বলো ।
–বিরক্ত করো না তো । ওদিকে গিয়ে বসো ।
– মন থেকে বলছো?
লিমা হেসে ফেললো । –তোমার ভাইটার কা- জ্ঞান দেখেছো? এখানে এসে দেখি কঙ্গো বন । চুলা, থালাবাটি সব কিনেছেন, হাঁড়ি কেনেননি । একটু আগে সজল ভাইকে পাঠিয়ে হাড়ি কিনিয়ে আনলাম । অবস্থাটা ভেবে দেখো?
– ভালই হলো ভাবী । এখন থেকে তোমার বাসায় মাঝে মাঝে বেড়াতে আসা যাবে । তুমি আবার ঝাড়ু মারবে না তো?
লিমা তার পিঠে ধাঁই করে একটা কিল বসিয়ে দিলো ।

–মারবই তো। সব কটাকে মারবো। এখানে একা একা আমি থাকবো কি করে? ইচ্ছে হলো আর গিয়ে নিয়ে এলো। খুব স্বামীগিরি ফলালো।
– সজলকে তোমাদের সাথে থাকতে বলো না। তুমিও একজন সঙ্গী পাবে, ওর সুবিধা হবে।
– বলেছিলাম। তার আবার মান-সম্মান জ্ঞান টনটনে। রাজী হলেন না।
স্বপ্নিল ড্রয়িংরুম থেকে ডাকলো– চঞ্চল, এদিকে শুনে যা।
লিমা বললো –যেও না।
– কেন?
– গেলেই তোমাকে বাড়ি ছাড়ার ফন্দি দেবে।এর মধ্যে আমাকে দুবার বলেছে। তুমি চুপচাপ এখানে বসে থাকো। স্বপ্নিল আবার ডাকলো। চঞ্চল উত্তর দিলো না।
সোলায়মান এবং শিরিন এলেন সাতটার কিছু পরে। সজলকে দেখেই সোলায়মান রাগী স্বরে বললেন – বাড়ী ছেড়ে গেছো, অল রাইট। কিন্তু পরে আমার সাথে যোগাযোগ করলে না কেন? তুমি এতটা বেয়াদপ আমি চিন্তাও করিনি।
শিরিন তাকে থামালেন। – ও বেচারী লজ্জায় তোমার সামনে যেতে পারে নি। ওকে আর অযথা ধমক দিও না।
সোলায়মান বললেন– তুমি দু'-এক দিনের মধ্যেই আমার অফিসে আসবে।
স্বপ্নিল তার বাবার আশেপাশেই ঘুরছিলো। সে সুযোগ পেয়েই বললো– সজল না খেয়ে মরে গেলেও ওনার কাছে যাবে না। সবারই একটা নীতিবোধ থাকা উচিত।
সোলায়মান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন –দেখেছো শিরিন, তোমার ছেলের কা-টা দেখেছো? বাড়ীতে দাওয়াত করে এনে নীতিবোধ শেখাচ্ছে।
লিমা স্বপ্নিলকে একটা কড়া ধমক দিলো। –যা মুখে আসে তাই বলো নাকি? যাও, বাইরে থেকে হাটাহাটি করে এসো।
স্বপ্নিল নির্বিকার মুখে বললো– তা যাচ্ছি। কিন্তু ...
– কোনো কিন্তু নয়।
সজলও স্বপ্নিলের সঙ্গ নিলো। বারান্দায় এসে দাড়ালো তারা। স্বপ্নিল বললো– খবর্দার ওর কাছে যাবে না। খুনী মানুষ।
সজলের অন্য একটি প্রসঙ্গ মনে পড়ে গেছে। সে বললো –স্বপ্নিল ভাই, আপনি কি নিয়ামত সাহেবকে আমার চাকরীর জন্য বলেছিলেন?
– কোন নেয়ামত?
– এলিফ্যান্ট রোডে থাকেন। আপনাদের আত্মীয় হন।
– ও, নেয়ামত চাচা। না তো। তার সাথে তো আমার অনেক দিন দেখাই হয় না। কেন?
– না, এমনি। উনি আমাকে একটা চাকরির আশা দিয়েছেন।
– এটা নিতে পারো। মানুষ ভালো।
সজলের বুঝতে বাকী থাকলো না, এ সবই নেলীর কাজ। সে নতুন করে ধাঁধাঁয় পড়লো। তার ভালো মন্দ নিয়ে নেলী কেন উদ্বিগ্ন? এই সবের কারণ কি শুধুই সহানুভূতি? জানার কোনো উপায় নেই।
নেলী এলো আটটার দিকে। তার সাথে একজন সুদর্শন দীর্ঘদেহী ছেলে। নেলী তাকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। – শিহাব আহমেদ। এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম, বাবা।
সোলায়মান বললেন –তুমি তোরাব আহমেদের বড় ছেলে না?
শিহাব বিনীত ভঙ্গিতে বললো –জ্বি।

– তোমার বাবার সাথে আমার পরিচয় আছে। তোমাকেও দু-একটা পার্টিতে আমি দেখেছি। তোমরা দু'জন যে পরস্পরকে পছন্দ করেছো এটা জেনে আমি খুশি হয়েছি।
স্বপ্নিল নিরীহ কণ্ঠে বললো– তবে শিহাব, একটা কথা না বলে পারছি না। তোমার বাবা খুবই নীচু প্রকৃতির মানুষ। তার সম্বন্ধে অনেক বাজে কথা শোনা যায়।
শিহাব অপ্রতিভ হয়ে পড়লো। লিমা স্বপ্নিলকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেলো। চঞ্চল লজ্জিত কণ্ঠে বললো– শিহাব, আপনি কিছু মনে করবেন না। ভাইয়া এই রকমই।
–জি না, এতে মনে করার কি আছে।
নেলী এই সব ব্যাপারে মনোযোগী ছিলো না, সে সজলকে লক্ষ্য করছিলো। ছেলেটার স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা দেখে তার নিজেরই কষ্ট হতে লাগলো। সে ডাকলো, 'সজল ভাই, চলুন আমরা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। শিহাব আসুন।'
শিহাব বাইরে এসে বললো– পরিচয় দেবার দরকার নেই। আমি জানি আপনি সজল। নেলী আপনার কথা প্রায়ই বলে। সজল অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লো। তার কথা এই ভদ্রলোককে বলার কি দরকার ছিলো? নেলী এমন সব কাজ করে।
নেলী বলল – সজল খুব ভালো জোক বলতে পারে। এই সজল আপনার সেই জোকটা বলেন না। সেই যে পঁচিশ বছর। সজল নিচুস্বরে বললো– জোকটা আমার মনে নেই।
শিহাব বললো – কোন জোকটা বলুনতো ? এক কৃষকের পা ভেঙ্গে গেছে, তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো...
–জ্বি, সেটাই।
– খুব মজার জোক। নেলী, জোকটা আমার মনে আছে। আমি বলবো?
নেলী ক্ষুণ্নস্বরে বললো– না, থাক। সবাই ভালো করে বলতে পারে না।
– আমার কিন্তু এই ব্যাপারে বিশেষ সুখ্যাতি আছে। আমার জোক শুনে সবাই হেসে গড়াগড়ি যায়।
– আপনি নিজেই নিজের এতো সুখ্যাতি করেন। ভালো লাগে না।
শিহাব হেসে উঠলো। – বাহ্, সত্যি কথাটা বলবো না।
নেলী বললো– সজল, আপনার চাকরির কতদূর?
–ইন্টারভিউ দিয়েছি। এখনো রেজাল্ট পাইনি।
– চিন্তা করবেন না। চাকরি আপনার হবে।
শিহাব বললো – একটা কথা বলি সজল, কিছু মনে করবেন না। আপনার আপত্তি না থাকলে আমাদের কোম্পানীতেও জয়েন করতে পারেন।
নেলী তীক্ষ্ণস্বরে বললো– না না, ওনার ব্যাংকের চাকরিই ভালো।
শিহাব নেলীর এই তিক্ত প্রতিক্রিয়ার কারণ বুঝলো না। সে লজ্জিত হয়ে পড়লো। –আমি কিছু মনে করে কথাটা বলি নি।
লিমা খেতে ডাকছে। নেলী বললো– চলুন, খেয়ে নেই। ভাবী একা মানুষ, তাকে একটু সাহায্য করাও দরকার।
সজল একটা অদ্ভূত কাজ করলো। এমন একটা কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব, সেটা দু'মিনিট আগেও সে ভাবেনি। সবার অগোচরে না খেয়েই চলে এলো সে। কেন এলো তা অবশ্য খুব পরিষ্কার নয়। শুধু একটি কথা সজল নিশ্চিতভাবে বুঝেছে, নেলীর হৃদয়ে সে সম্পূর্ণ অবাঞ্চিত কেউ নয়। সেখানে তার জন্য বিশেষ ধরনের কিছু অনুভূতি সংরক্ষিত হয়ে আছে। এটা জেনে তার খুবই ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে, এখন থেকে কোনো কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না। তার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরষ্কারটি সে পেয়ে গেছে।

বত্রিশ

সজল রুমা-ঝুমাকে পড়িয়ে যখন বাসায় ফিরলো তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা। মেয়ে দুটো বেড়াতে যাবে, ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সজলকে ছেড়ে দিয়েছে তারা। সজলও বেঁচেছে, আজকে গল্প বলার পাঠটা বাদ গেছে। সে গল্পের বই-টই প্রায় পড়েই না, ওদের জন্য নিত্য-নতুন গল্প কোথায় পাবে।
তাকে ফিরতে দেখেই সানোয়ার হেকে উঠলো। –এই যে সজল ভাই, কা-টা দেখেছেন!
– কি কা-?
– চঞ্চল ভাইয়ের বিয়ের দাওয়াত। নেলী আপা নিজে এসে দিয়ে গেছেন। আমার হাতেই দিলেন। বসতে বললাম, কিন্তু বসলেন না।
– এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কি দেখলেন?
– মুখে কি বলবো ভাই। নিজের চোখেই দেখবেন।
সানোয়ার তাকে টানতে টানতে জায়েদ সাহেবের বাসার মধ্যে ঢুকলো। সজল অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো একটি নিমন্ত্রণ পত্রের উপর জায়েদ সাহেবের সমস্ত পরিবার অসীম আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। জায়েদ সজলকে দেখেই বললেন– কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন। শুধু আপনাকে নয়, আমাদের সবাইকে দাওয়াত করে বসে আছেন ওঁরা। চিন্তা করা যায়?
তার স্ত্রী বললেন– কেমন অসুবিদায় পড়া গেছে, বলুন তো ভাই? অতো বড় লোকের বাসায় যে বেড়াতে যাবো, আমাদের কি তেমন জামাকাপড় আছে।
জায়েদ বললেন– তাছাড়া বিয়ের দাওয়াত, কিছু একটা তো নিয়ে যেতে হবে, নাকি? বুঝলেন সজল সাহেব, এতক্ষণ ধরে আমরা সবাই আলাপ করছিলাম। আপনি একটা বুদ্ধি দিন না ভাই।
সজল হাসতে লাগলো। – আমি এসবের কিছুই জানি না। আপনারাই ভেবে চিন্তে একটা কিছু বের করুন না।
সানোয়ার উদার কণ্ঠে বললো– টাকা পয়সা নিয়ে ভাববেন না। সবাই মিলিয়ে ঝিলিয়ে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।
দেখা গেলো, প্রায় সবারই এই ব্যাপারে নিজস্ব মতামত রয়েছে। জায়েদের শিশু সন্তানেরাও প্রবল উৎসাহ নিয়ে সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছু বলতে লাগলো। সজল মুগ্ধ হয়ে গেলো। একটি বিয়ের দাওয়াত যে এমন একটি উৎসব মুখর পরিবেশ তৈরি করতে পারে সজলের ধারণায় ছিলো না।
সানোয়ার হঠাৎ চেঁচিয়ে বললো – এই যাহ, কি মারাত্মক ভুল। নেলী আপাতো আপনাকে একটা চিঠি দিতে বলেছিলেন। এই গোলমালের মধ্যে সে কথা খেয়ালই নেই।
চিঠির বক্তব্য খুবই সামান্য।
সজল, আগামীকাল সকাল দশটায় মৌলিতে আসবেন। কিছু কথা আছে।
সানোয়ার বললো– দেরী করে দেওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হলো না তো?
– না, না। তেমন জরুরি কিছু নয়।
জায়েদ বললেন– তা হলে আমাদের আলাপটা সেরে ফেলা যাক।
সজল অন্যমনস্কভাবে বললো -এতো তাড়া কিসের? এখনো বেশ কিছুদিন বাকি আছে।
– তা হোক, আমাদেরকে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সবাই গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়লো । সজল চুপিসারে সেখান থেকে সরে এলো তার কেন যেন খুব ভয় হচ্ছে । নেলী এভাবে তাকে কেন ডেকে পাঠাবে? তার কি যাওয়াটা ঠিক হবে? সজল কিছু বুঝতে পারে না । অন্ধকার উঠোনে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকে সে ।

তেত্রিশ

নেলী গাড়িতে বসেছিলো । সালোয়ার কামিজ পরেছে সে । শাড়ি পরে গাড়ি চালাতে অসুবিধা হয় । তার মুখে প্রসাধনীর কোনো চিহ্ন নেই । সজলের জন্য সে নিজেকে বিশেষভাবে সাজানোর প্রয়োজন বোধ করে না । তার জীবনে এই একটি মাত্র পুরুষই আছে যার সামনে সে অকৃত্রিম অবয়ব নিয়ে দাঁড়াতে পারে । একজন পুরুষকে মুগ্ধ করবার স্বাভাবিক রমণীয় তাগিদ এখানে কাজ করে না ।
সজলকে দেখেই সে মুখ বাড়িয়ে ডাকলো । সজল দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো । তাকে বেশ চিন্তাক্লিষ্ট মনে হচ্ছে । উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো –কি হয়েছে নেলী?
নেলী হেসে ফেললো । – আপনি মুখটাকে এমন করে রেখেছেন কেন? আমার কিছুই হয়নি । আপনার সঙ্গে একটু গল্প করবো তাই ডেকেছি । নিন, গাড়িতে উঠুন ।
সজল ভেতরে ঢুকলো । নেলীকে দেখে খুবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, কিন্তু সে জানে কিছু একটা ঘটেছে । এই মেয়েটার মুখ দেখলেই সে আজকাল অনেক কিছু বুঝতে পারে । এই ক্ষমতা কি করে জন্মালো তা অবশ্য সজল নিজেও জানে না ।
নেলী সহজ কণ্ঠে বললো – জানেন সজল, আমার অনেক দিনের সখ ইটালিয়ান হোটেলে চাপাতি এবং গুড় খাওয়া । ভাঙা নড়বড় বেঞ্চে আয়েস করে বসে পেট পুরে খাবো । নেলী শব্দ করে হাসতে লাগলো ।
সজল বললো – আপনার কি হয়েছে?
– কি হবে আবার? কিছু হয়নি ।
– আমার কাছে লুকোবেন না ।
– আপনি বডডো নাছোড়বান্দা । বলছি কিছু হয়নি ।
সজল চুপ করে গেলো । যাই ঘটে থাকুক নিজের ইচ্ছাতেই এক সময় প্রকাশ করবে নেলী । অপেক্ষা করাই ভালো ।
নেলী সত্যি সত্যিই একটা রুটি পাটালীর দোকানের সামনে গাড়ি থামালো । স্বচ্ছন্দে নিচে নেমে একখানা বেঞ্চি দখল করল সে । এই সজল, বোকার মতো বসে আছেন কেন? নামুন ।
দোকানী মেয়েটা একগাল হেসে বললো– বড়লোক আফার বুঝি রুটি খাওনের সখ অইলো? এই হগল তো গরিবের খাওন–
নেলী হাসতে হাসতে বললো– এই মেয়ে, তুমি তো খুব সুন্দর কথা বলো । এই রুটিগুলো কি তুমি নিজের হাতে বানিয়েছো?

– জ্বে আফা। মাইনষে কয় আমার হাতের রুটির সোয়াদই আলাদা। কিন্তু আফনেরা আফা খাইতে পারবেন না। বড়লোকি খানা খাইয়া এইসব–
– পারবো, পারবো। খুব পারবো। তুমি আমাদেরকে দুটো করে রুটি আর একমুঠো গুড় দাও।
নেলী দ্বিধাহীনভাবে পরম কৌতূহলে সেই রুটি গুড় খেতে লাগলো। এই দৃশ্য দেখবার জন্য চারদিকে বেশ একটা ভীড় জমে গেলো। একখানা রুটি খেয়ে উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে সে বললো– এর চেয়ে ভালো খাবার সারা পৃথিবীতে নেই। অপূর্ব। অপূর্ব।
সজল বললো– নেলী, এবার চলুন।
সে মেয়েটিকে একশ টাকার একটা নোট দিয়ে দিলো। –এটা তোমার রুটি গুড়ের দাম না। বোন হিসাবে উপহার দিলাম। রুটি গুড় ফ্রি।
মেয়েটি অভূতপূর্ব আনন্দে বাক্‌হারা হয়ে পড়লো।
প্রায় মাইল দু'তিন দূরে এসে গাড়ি থামালো নেলী। নেমে গিয়ে দুবার বমি করলো। সজলকে নামার সময় না দিয়েই হাসিমুখে ফিরে এলো।
– আর হবে না। আমি ঠিক আছি। ঐ জিনিস মানুষ খায়!
– খেলেন কেন অযথা?
– একটা অনিয়ম করতে ইচ্ছে হলো।
– আপনার কি হয়েছে নেলী?
নেলী আলতো করে হাসলো। –আমি রাতে শিহাবকে বিয়ে করেছি।
সজল বিস্মিত হলো না। নেলীর জন্য এটা স্বাভাবিক। –বাসায় জানে?
– না। আপনাকেই প্রথম বললাম। আচ্ছা, আমি কি ভুল করেছি?
– না। শিহাব চমৎকার মানুষ। তাকে আমার খুবই ভালো লেগেছিল।
– জানেন, সেদিন আপনি কাউকে না বলে চলে গেলেন দেখে ও যা দুঃখ পেয়েছিল না। ভেবেছিল ওর জন্যেই বোধহয় আপনি এমন কাজ করেছেন।
–না না, তা হবে কেন!
– আমাকে বলতে হবে না। আপনাকে আমি বেশ ভালো করেই চিনেছি আমাদের দু'জনার চরিত্রে এই একটা অদ্ভুত মিল আছে। আমরা আচমকা সিদ্ধান্ত নিয়ে এমন সব কাজ করে ফেলি যে জন্যে পরে অনুশোচনা করি। জানেন, আমার এখন মনে হচ্ছে শিহাবকে বিয়ে না করলেও হতো।
– হঠাৎ এমন কাজ কেন করতে গেলেন? শিহাব নিশ্চয় চাপ দিচ্ছিলেন না।
– নাহ্। আমিই ওকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছি। এমন গোপনে বিয়ে করতে চায়নি ও। কাজটা কেন করলাম জানেন? সজল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। নেলী হাসলো।
– আপনার জন্য। আপনি হয়তো জানেন না, আপনার প্রতি আমার কিছুটা দুর্বলতা আছে।
– জানি।
– সেটাই স্বাভাবিক। এসব ব্যাপার লুকিয়ে রাখা যায় না।
নেলী গাড়িতে গতি সঞ্চার করলো। – কোন দিকে যাওয়া যায় বলুন তো?
– আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন।
– কেন?
– আমি কিছুক্ষণ একাকী হাঁটবো।
– আপনার কি মন খারাপ হয়ে গেলো?
– বলতে পারবো না। আমার এখন নিজের সাথে কিছু কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আমাকে নামিয়ে দিন।

নেলী গাড়ি থামালো। সজল নামলো। – নেলী, এমন কিছু করবেন না যাতে শিহাব কষ্ট পান। উনি চমৎকার একজন মানুষ।
নেলী শুকনো মুখে বললো –সজল, বেশি দুঃখ পাবেন না। আমরা যেমন বন্ধু ছিলাম তেমনই থেকে যাবো। বরং এখন থেকে আমাদের বন্ধুত্বটা হয়তো আরো নিষ্পাপ, মধুর হয়ে উঠবে। পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ঠিক না?
সজল নিঃশব্দে মাথা নাড়লো। তার গলা অসম্ভব ভারি হয়ে উঠেছে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও নেলীর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে চায় সে। নেলী তাকে একই সরলরেখায় অনেকদূর হেঁটে যেতে দেখলো। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো।

চৌত্রিশ

দিনের পর দিন যায়, কারো জন্যে দ্রুত, কারো জন্যে ধীরে। চঞ্চলের বিয়ে হয়ে যায়। জায়েদ সাহেবের যাওয়া হয় না। রিক্সা থেকে পড়ে গিয়ে তার ছোট মেয়েটির হাত ভেঙ্গে গেলো। তাকে ফেলে কি করে যান? উপহার দেবেন বলে একটা শাড়ি কিনেছিলেন, সেটি সানোয়ারের হাতে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সজল যায় নি। তার না যাওয়ার পেছনে কোনো যুক্তি নেই।
লিমার একটি মেয়ে হয়েছে, ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মতো সুন্দর, মায়াময়। স্বপ্নিলের জেদ উঠেছিলো, মেয়ের নাম রাখবে রাজিয়া সুলতানা। লিমা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করায় পরাজয় মানতে হয়েছে তাকে। শেষটায় খুব সুন্দর একটা নাম রাখা হয়েছে। কুহেলী। সে সারাদিন হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়, তার দিকে তাকিয়ে কেউ হাসলে সেও খিল খিল করে হেসে ওঠে। সজল চাচুকে তার খুব পছন্দ।
সজলের ব্যাংকের চাকরিটা হয়েই গেলো। কিন্তু জায়েদ সাহেবের বাসা সে ছাড়লো না। এই বাড়ির সবার প্রতিই কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। চলে যাওয়ার কথা মনে হলেই কষ্ট হয়।
নেলী প্রায়ই আসে। শিহাবও আসে। তারা যতক্ষণ থাকে, সমস্ত বাড়িটায় ঝড়ো আনন্দে মাতন ওঠে। সানোয়ার স্পেশাল খিচুড়ি খাওয়ায়। অপূর্ব এক সৌহাদ্রতা।
কিন্তু তারপরও, সজল তার হৃদয়ের গভীরে একটা শূন্যতা পুষে রাখে। একটি অদ্ভুত প্রশ্ন তাকে প্রায়ই আলোড়িত করে। ভালোবাসার কি মুত্যু হয়?
বেঁচে থাকার জন্য, সংগ্রাম করার জন্য প্রতিটি মানুষেরই কিছু কিছু সমাধানহীন প্রশ্ন থাকা উচিৎ। সজলও এই জিজ্ঞাসাটিকে সযত্নে লালন করতে থাকে।
দিনের পর দিন যায়। কারো জন্য দ্রুত, কারো জন্যে ধীরে।